চিত্রপট।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

রায় এম্, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স
৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, :: :: কলিকাতা।

১৲

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার,

৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

চিত্র	...	১
স্মৃতি	...	১৩
পথের দেখা	...	২৫
পুরাণো ডায়েরী	...	৪২
নিশি	...	৬০
কন্যাদায়	...	৭৩
কাঁচের দোয়াত	...	৯০
স্বয়ম্বরা	...	১২৫
সন্ন্যাস	...	১৩৯
মধুপুরে	...	১৫৪
স্মৃতি-চিহ্ন	...	১৬৯
ঘড়িচুরি	...	১৯১

শ্রীমতী নির্ঝরিণী

কল্যাণীয়াসু—

ঝুন্নুনি,

মা আমার, অনন্ত মহাসাগরের কত উর্ম্মি-বালুকাময় সংসার-সৈকতে তা'দের খেলার চিহ্ন রেখে যায়, আবার নূতন তরঙ্গ এসে সে চিহ্ন ধুয়ে নিয়ে যায়। সংসারে কেবল এই খেলা! গোধূলির আকাশে নানা বর্ণে মেঘের চিত্র একটীর পর একটী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, আবার মুছে যায়। চিত্রকর আকাশের সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোন একটী চিত্র তার তুলি দিয়ে পটে এঁকে ধরে রাখে; সে যেন অসীমকে সীমার বন্ধনে বদ্ধ করে রাখ্‌বার চেষ্টা। মানুষ মন দিয়ে সে সসীম ছবি আঁক্‌ছে, আবার মনকেই তা'তে ডুবিয়ে দিয়ে অসীমে লয় পেয়ে যাচ্ছে। মন দিয়ে একটা জগৎ গড়্‌ছে, আবার নিজের গড়া জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে জগদাতীত ভাবে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। কল্পনা-বায়ুতে উর্ম্মিহীন অপার সমুদ্রে সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তুল্‌ছে, আবার সেই সুখ-দুঃখের অনুভূতির পথে চল্‌তে গিয়েই সুখ-দুঃখ বোধাতীত অসীম আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌ছে।

মা আমার, সংসার-সমুদ্রের তীরে ব'সে অনন্তের লীলা-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ আমারও ছবি আঁক্‌তে সাধ হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে আঁক্‌তে না পার্‌লে ছবিও সম্পূর্ণ হয় না, প্রাণের রঙ্গে রঞ্জিত কর্‌তে না পার্‌লে চিত্র পরিস্ফুট হয় না, তাই আঁকা হলে দেখ্‌লাম যে, অপটু হস্তে অঙ্কিত কতকগুলি কেবল অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ রেখা চিত্র হয়েছে। কিন্তু এ তোমার মায়ের আঁকা বলে তবুও তোমার ভাল লাগ্‌বে, তাই তোমার হাতে দিলাম।—ইতি··

কলিকাতা সন ১৩২৩, ১৩ই আশ্বিন

চিত্রপট।

চিত্র।

১

ত্রয়োদশ বৎসর পরে পার্ব্বতী শ্বশুরগৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই তাহার বিবাহের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহার পিতৃগৃহের স্মৃতির সহিত বিবাহ-রাত্রির স্মৃতি এমন ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, একটীর কথা মনে করিতে গেলেই আর একটী মনে পড়িয়া যাইত। এইস্থানে দেবদারুর তোরণ হইয়াছিল, এইস্থানে নহবৎ বসিয়াছিল, এই সমস্ত থাম ফুলের মালা দিয়া ঘেরা হইয়াছিল। সেই দীপের মালা, সেই লোকের কোলাহল, সেই শঙ্খের ধ্বনি, সে সমস্ত যেন এখন স্বপ্ন! সিঁথির সিঁদূরের সঙ্গে বিবাহের অন্য সমস্ত চিহ্নই মুছিয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচ বৎসরের শিশু অমরেশ এখন শেষ চিহ্ন। বিবাহসভায় যখন সে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"—সে কথা এখনও কানে বাজিতেছে। তখন কে জানিত যে, সেই লক্ষ্মী আবার অলক্ষ্মীর বেশে ত্রয়োদশ বৎসর পরে তাহার শৈশবনিকেতনে ফিরিয়া আসিবে।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল, মূর্চ্ছিতের মত পার্ব্বতী ধূলায় বসিয়া পড়িল। অমরেশ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পার্ব্বতীর মনে পড়িল, কন্যা-বিদায়ের দিন তাহার ভাই নরেনও এমনি ব্যাকুলভাবে "দিদি, দিদি" বলিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়াছিল। নরেনের সেই শৈশবের সুন্দর মুখ.ত্রয়োদশ-বর্ষ একই ভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, কালে তাহার উজ্জ্বল রেখা বিন্দুমাত্রও মুছিতে পারে নাই।

২

হরশঙ্কর বাবুর বাড়ীর পাশেই তাঁহার ভ্রাতার বাড়ী, প্রাচীরে একটী ছোট দুয়ার কাটান ছিল, তাহাতেই উভয় বাড়ীতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইত। পার্ব্বতী আসিয়াছে শুনিয়া খুড়িমা তাহাকে দেখিতে আসিলেন।

নরেনের স্ত্রী সুহাসিনী আসন পাতিয়া দিয়া দেয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া অপ্রসন্নভাবে নখ খুঁটিতে লাগিল।

সুহাসিনীর অপ্রসন্নতার কারণ যথেষ্টই ছিল। যদিও তাহার বয়স কেবল চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাংসারিক জ্ঞান ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। পার্ব্বতী ছেলে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ ছেলে ও পার্ব্বতীর জন্য মাসে মাসে কত খরচ পড়িবে সে বিষয়ের একটা মুখে মুখে হিসাব ঠিক করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রাঁধুনীকে বিদায় করিয়া দিবার কল্পনা তাহার মনে উদয় হওয়ায় কতকটা আশ্বাসেরও সঞ্চার হইয়াছিল। আজ আবার খুড়িমাকে

অযাচিত ভাবে আত্মীয়তা করিতে আসিতে দেখিয়া তাহার মনটা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

খুড়িমা পার্ব্বতীকে কোলের কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "একি আমাদের সেই বুড়ি? তোর এ কি চেহারা হয়েছে রে!" খুড়িমার চোখের জল পার্ব্বতীর রুক্ষ কেশের উপর আর পার্ব্বতীর চোখের জল খুড়িমার পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া খুড়িমা পার্ব্বতীকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতীর পিতা পার্ব্বতীকে রাজার ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন, তবু তাহার জীবনে কি সুখ ছিল? স্বামীর প্রেম?—তাহা সে কখনও পায় নাই। বিলাসে উন্মত্ত স্বামী পত্নীর দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া শ্বশুরালয়ে সম্মান ছিল না, ধনীর পুত্রবধূর দরিদ্র পিতৃগৃহে আসিবার পথও ছিল না। তিনটী সন্তান হারাইয়া কেবল অমরেশ তাহার শেষ সান্ত্বনার উপায়। স্বামী যে দিন সঙ্গী বন্ধুবর্গ লইয়া শিবরাত্রির উৎসব আমোদে কাটাইবার জন্য কাশীতে গিয়াছিলেন, সেদিন পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একবার তাহাকে বলিয়াও যান নাই। সেই তাঁহার শেষ বিদায়। সাঁতার দিতে গিয়া তাঁহার শরীর গঙ্গার স্রোতে যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, এই সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে পার্ব্বতীর সকল অধিকার শেষ হইয়া গেল, দরিদ্রের কন্যা ভিখারিণী বেশে সন্তান-ক্রোড়ে দরিদ্র পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিল, তাহার ত্রয়োদশ-বর্ষের এইমাত্র সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চিত্রপট।

খুড়িমা বলিলেন, "দিদি যদি এসময় এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে বড় ভাল হইত। দিদি কাশী গিয়ে অবধি এদিকটা যেন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, সেই অবধি আমি আর এদিকে আসিতেও পারি না।"

পার্ব্বতী চোখের জল মুছিয়া বলিল, "বাবা তো আর দেশে আসিবেন না, মা বাবাকে একলা রেখে কেমন করিয়া আসিবেন।"

"তবে না হয় তুই একবার কাশীতেই যা, তাঁরা কখন আছেন, কখন নাই। হয়তো আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমাদের পঙ্কু শিগ্‌গির কাশী যাবে সেই সঙ্গে যেতে চাস্‌তো আমি সব ঠিক করে দিতে পারি।"

৩

বৈঠকখানায় হরশঙ্কর বাবুর একখানি তৈল-চিত্র ছিল। অনেক দিন ধূলি পড়িয়া পড়িয়া সেখানি ভাল করিয়া দেখা যাইত না। পার্ব্বতী দ্বিপ্রহরে বাহিরে গিয়া একমনে ছবি খানি পরিষ্কার করিতেছিল।

সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "নেই কাজ তো খই ভাজ, ঠাকুরঝির হ'য়েছে তাই, যদি ততক্ষণ কাঁথাগুলো সেলাই করেন তো কাজ হয়।"

ছবি পরিষ্কার করিতে করিতে পার্ব্বতীর মন এতই একাগ্র হইয়াছিল যে, তাহার সময়ের জ্ঞান ছিল না। হাতের কাপড়খানি চোখের জলে ভিজিয়া যাইতেছিল।

নরেন আফিষ হইতে সাহেবের বকুনি খাইয়া আসিয়াছিল,

তাহার মেজাজটি সপ্তমে চড়িয়াছিল। আসিয়াই প্রথমে পার্ব্বতীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল,—রুক্ষস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "দিদি, বাইরে এসে কি হচ্ছে?"

দিদি নরেনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখনও তাহার চোখে জল ছিল। "নরু!" বলিয়া ডাকিতে গিয়া মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "বাবার ছবিখানি বড় অপরিষ্কার হ'য়েছিল তাই পরিষ্কার কর্‌ছিলাম।"

সুহাসিনী দুয়ারের পাশে আসিয়া বলিল, "আজ বুঝি খাবার তৈরী হয়নি?"

পার্ব্বতী খাবার করিবার কথা ভুলিয়াছিল, ভ্রাতার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। "এই আমি যাচ্ছি" বলিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আর কাজ নাই, থাক্।"—বলিয়া ক্রুদ্ধ নরেন ছবিখানি পাশে সরাইয়া রাখিতে গেল, কিন্তু তাহার অস্থির হস্তচালনায় ছবিখানির উপর কপাটের ধাক্কা লাগিয়া ছবির এক পাশের ফ্রেম ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন সময় নীচের দরজায় হাঁক পড়িল, "বাবু, তার আয়া।"

নরেন ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, কাশীতে বাবার বড় অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে।" বলিয়াই ভগ্ন তৈল-চিত্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

পার্ব্বতী ব্যস্ত হইয়া নরেনের হাত ধরিল, বলিল, "নরেন, অত অস্থির হ'য়ো না, আগে হাতে মুখে জল দাও।"

৪

কাশীতে কে যাইবে ইহা লইয়া দুই ভাই বোনে অনেক পরামর্শ হইল। নরেনের ছুটি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর সুহাসিনী সন্তান-সম্ভাবিতা, তাহাকেই বা কোথায় রাখিয়া যাওয়া যায়। এক, খুড়ামহাশয়ের বাটী নিকটে আছে, কিন্তু সুহাসিনী সেখানে থাকিতে কোন মতেই রাজী নহে।

অবশেষে পার্ব্বতী বলিল, "তবে তুমি থাক। আমি পঞ্চুর সঙ্গে রাত্রের মেলে চলিয়া যাই। তারপর তুমি যাহাতে ছুটী পাও সে চেষ্টা করিও।

নরেন বলিল, "অমরকে তো সঙ্গে নিয়া যাইবে ?"

পার্ব্বতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, "কাশীতে ? না না, কাশীতে আমি অমরকে নিয়ে যেতে পার্‌ব না।"

অমর সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া গিয়াছিল, পার্ব্বতী ঘুমন্ত অমরের মুখচুম্বন করিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় পার্ব্বতী সুহাসিনীর দু'টী হাত ধরিয়া বলিল, "রাণি, অমরকে একটু ভাল করিয়া দেখিস্ দিদি!"

অমর সকালে উঠিয়া মাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরের চারিদিক খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও মায়ের কোন সন্ধান না পাইয়া বাহিরের দুয়ারের পাশে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দু'টী ক্রমেই লাল হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সুহাসিনী জ্বালাতন হইয়া উঠিল, বলিল, "ভাল এক বিপদে পড়েছি যা হোক্।"

নরেন সকালে প্রাইভেট টিউসনে বাহির হইয়াছিল। অমরেশকে

দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—"কি হয়েছে অমর !"

অমর "মা কই !" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

নরেন আদর করিয়া বলিল, "মা আস্‌বে এখন, আয় আমার সঙ্গে—রাণি, অমরকে কিছু খাবার দাও তো !"

সুহাসিনী খাবার লইয়া আসিল, বলিল, "নিজে কিছু মুখে দেবে না, ভাগ্নেকে আদর করেই পেট ভরবে।"

এই রকম করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে খবর পাওয়া গেল, হরশঙ্কর বাবু কিছু ভাল আছেন।

৫

পার্ব্বতীর অন্য কোন দিকে মন ছিল না, ধ্যানমগ্না পার্ব্বতীর ন্যায় পার্ব্বতী একমনে পিতৃসেবায় মগ্ন ছিল। ক্রমে হরশঙ্কর বাবু একটু ভাল হইলে পার্ব্বতী বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গেল।

মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া পার্ব্বতী গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া একমনে গঙ্গার স্রোতের দিকে চাহিয়াছিল। এই স্রোতে তাহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী ভাবিতেছিল, "আমি যদি এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতাম !" নিকটেই একটা চিতার আয়োজন হইতেছিল, পার্ব্বতী ভাবিল, "আমার চিতা যদি এইখানে জ্বলিত !"

গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ঘরে ফিরিতেছিল, যাহারা স্নানে আসিতেছিল—সকলেই বিস্মিত হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিতেছিল ; পার্ব্বতী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি কেবল গঙ্গার বারিরাশিতে নিবদ্ধ ছিল। কেবল

তাহার মনে হইতেছিল, এখানে তাহার যে অমূল্য মাণিক হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিলে হয়ত তাহা পাওয়া যাইবে।

এমন সময় একটী বালকের ক্রন্দনে তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, একজন রমণী গঙ্গাস্নানে নামিয়াছেন, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার আঁচল ধরিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ কাদায় পা পিছ্লাইয়া ছেলে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

পার্ব্বতীর অমরের কথা মনে পড়িল, অমর যে মা ছাড়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। পার্ব্বতী আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল, "এখনও আমার মরবার সময় হয় নাই।"

পূজা শেষ করিয়া ঘরে আসিতেই অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বভাব-প্রসন্ন মুখখানিতে কালিমার সঞ্চার হইয়াছে।

পার্ব্বতী ভীতা হইয়া বলিল, "কি হয়েছে মা?"

"বুড়ি, তোর দেরি দেখে উনি ভারি ব্যস্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন, তুই বুঝি গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিস্।"

"তাই তুমি এত ভয় পেয়েছ মা?"

"না মা, তা নয়, ক'ল্কাতা থেকে তার এসেছে, অমরের কলেরা হ'য়েছে।"

শুনিবামাত্র পার্ব্বতী সেইখানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

৬

হরশঙ্কর বাবুর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পার্ব্বতীর গাড়ী লাগিল। পার্ব্বতী নামিয়াই উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া উপরে গেল। নরেন পঙ্কুর সহিত বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়াছিল—পার্ব্বতী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "অমর, আমার অমর কোথায়?"

নরেনের দিদির মুখের দিকে চাহিবার সাহস হইল না। অবনত-নেত্রে ভূমিতলের দিকে চাহিয়া রহিল।

পার্ব্বতী বলিল, “অমর কি নাই?” এই শব্দ কয়টী যে স্বরে পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া নরেন ও পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল।

নরেন রুদ্ধস্বরে বলিল, “অমর হাঁসপাতালে।”

“বাঁচিয়া আছে?”

“আছে।”

পার্ব্বতী আপনার অসংযত বস্ত্র সংযত করিয়া লইল। দেয়া-লের দিকে আঙ্গুল হেলাইয়া বলিল, “নরেন, দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখ, এ কাহার ছবি? যাঁর ছবি, তুমি তাঁর সন্তান। মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তিনি কুড়াইয়া কোলে করিয়া গৃহে আনিতেন। আর তুমি—আমি তোমার নিকট আমার সর্ব্বস্ব ধন অর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, তুমি সেই অসহায় রুগ্ন মুমূর্ষু শিশুকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছ। তাই বুঝি ও ছবি যেন দেখিতে না হয় বলিয়া ধূলায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে। আমি চলিলাম। পঞ্চু তুমি হাঁসপাতালের রাস্তা চেন?”

পঞ্চু বলিল, “দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমার এক বন্ধু সেখানে কাজ করেন, আমি তোমাকে অমরের কাছে নিয়া যাইতে পারিব।”

৭

নরেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল, ঘরে আসিয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন রবিবার, আফিস ছিল না। কতবার ইচ্ছা হইতেছিল যে, অমর কেমন আছে একবার দেখিয়া আসে,

কিন্তু লজ্জার গুরুভার পর্ব্বতের মত তাহার মাথায় চাপিয়াছিল, সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। কি বলিয়া সে অমরকে হাঁসপাতালে দিয়া আসিল। তখন এ বিষয়ে কত অনুকূল যুক্তিই তাহার মাথায় আসিয়াছিল। এখন তাহার একটী যুক্তিও সে মনে করিতে পারিল না। কেবল আত্মগ্লানি আসিয়া বারবার তাহাকে কষাঘাত করিতে লাগিল।

সুহাসিনী যখন তাহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে আসিল, তখন আর তাহার সুহাসিনীর মুখের দিকেও চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সুহাসিনীর পরামর্শেই সে এই অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে; কিন্তু সুহাসিনীর দোষ কি? তাহার নিজের মন কেমন করিয়া এ কাজে সায় দিল।

সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়া সন্ধ্যার সময় নরেন আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না। শয্যা-কণ্টকী রোগীর ন্যায় শয্যা-ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিল। আসিয়াই দেখিল, সুহাসিনী ভূমিতলে পড়িয়া আছে, তাহার দিকে চাহিয়া সে যে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আর নরেনের বুঝিতে বাঁকি রহিল না।

নরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রাণি, অসুখ করেছে, আমাকে কেন বল নাই?" ভগ্নস্বরে সুহাসিনী বলিল, "ব'লে কি হবে? তুমি বিছানায় শু'য়ে আরাম কর গিয়ে।"

মরিতে বসিয়াও রমণী অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না।

নরেন আর বিলম্ব না করিয়া ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল।

৮

ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়াই নরেন দেখিল, তাহার ঘর লোকে পরিপূর্ণ। তাহার খুড়িমা, ভজু, পঞ্চু প্রভৃতি খুড়া মহাশয়ের বাটীর সকলেই প্রায় উপস্থিত। সুহাসিনী শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, পার্ব্বতী তাহার মাথার কাছে বসিয়া।

নরেন দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ প্রশান্ত, কোন বিকারের চিহ্নমাত্রও তথায় নাই। হস্ত-সঙ্কেতে নরেনকে নিকটে ডাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "অমর ভাল আছে।"

সমস্ত রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। সুহাসিনী বিকারের ঘোরে "মা, মা" করিয়া যখনই ছট্‌ফট্ করিতেছে, তখনই পার্ব্বতী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এদিকে দ্রুত ও নিপুণ হস্তে ডাক্তারের সমস্ত আদেশ সুশৃঙ্খলায় পালন করিতেছে; যখন যাহা প্রয়োজন তাহাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না। সেই অমৃতময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মৃত্যুও যেন সুহাসিনীর শয্যার নিকট আসিতে সাহস করিল না।

প্রভাতে সুহাসিনী একটু ভাল বোধ করিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "এখন তবু আশা হইতেছে।"

পার্ব্বতী তখন কোথায়? নরেন পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, পার্ব্বতী ভূপতিতা। দারুণ রোগের আক্রমণে সংজ্ঞাশূন্য। "দিদি" বলিয়া নরেন তাহার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। "নরু, ভাই!" বলিয়া পার্ব্বতী তাহাকে কোলে লইবার জন্য দুর্ব্বল হস্ত বাড়াইয়া দিল।

ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে ভাইবোনে ছাড়াছাড়ি হইবার সময়

এমনি স্নেহে দিদি ভাইকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী ত্রয়োদশবর্ষ কোথায় মিলাইয়া গেল।

নরেন কাঁদিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার্‌বে না। দিদি, তোমাকে বাঁচতে হবে।"

দিদি ক্ষীণহাস্যের সঙ্গে বলিল, "তোর মুখে আবার সেই 'দিদি' ডাক শুনে আমি জীবন পেয়েছি। নরু, ভাই আমার, আজ আবার আমার হারাণো ভাইটী আমি ফিরে পেলাম। ছবির কথা মনে আছে? বাবার ছবি ভাল করে বাঁধিয়ে সম্মুখে রাখ্‌বি। বাবার ছবি দেখে মনে কর্‌বি, বাবার মত হ'তে হবে। তাঁর পাশে একখানি মায়ের ছবি, রাণী যেন মায়ের মত অন্নপূর্ণা—"

দিদির মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার সংজ্ঞা হরণ করিয়া লইল।

স্মৃতি।

১

সমস্ত দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গম্ভীর নিস্তব্ধ। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ডাক্তার সাহেবের গম্ভীর মুখশ্রীর সহিত আকাশের গাম্ভীর্য্যের তুলনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে খাস্ কামরা হইতে আমার ডাক পড়িল।

অনেক চেষ্টায় চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরীটি জুটাইয়াছিলাম—সে চেষ্টার বর্ণনা করিতে গেলে কাহারও ধৈর্য্য থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। এত কষ্টে যে চাকরী-রত্ন লাভ করিয়াছি, নবীনমেঘে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ ডাক্তার সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন বদনে দন্তপংক্তির বিকাশ দেখিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই 'সাতরাজার ধন এক মাণিক'কেও বিসর্জ্জন দিবার স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিত। তথাপি পোষ্যবর্গের কথা স্মরণ করিয়া বহুকষ্টে আত্মসংযম করিতাম।

আমি দরিদ্রের সন্তান। পিতা ধনীর পুত্র হইয়াও ভাগ্যদোষে আজ নিঃস্ব। আমার বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য, আমার একখানি পাঠ্য পুস্তকের জন্য বাবা যখন ম্লানমুখে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি, পরিবারের এ দুঃখ দূর করিব। সেই প্রতিজ্ঞা চল্লিশ টাকার চাকরীটিতে পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

চিত্রপট।

কিন্তু "অদৃষ্ট" বলিয়া একটা কথা আছে। স্মৃতি ক্যাম্বেল হইতে বাহির হইয়াই বিনা কষ্টে পঞ্চাশ মুদ্রার চাকরীটি লাভ করিয়াছিল। এই দুর্ল্লভ চাকরী ও তদুপরি অতি দুর্ল্লভ ডাক্তার সাহেবের অনুগ্রহ, উভয়ই তাহার "অদৃষ্টে" ছিল বলিতে হইবে। আমিও ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে প্রায়ই যাহা লাভ করিতাম, তাহাও আমার "অদৃষ্ট"। অতএব অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া পোর্টম্যাণ্টো হইতে আর্য্য-মিশনের গীতা খানি বাহির করিয়া মনকে নির্ব্বিকার করিবার চেষ্টা করিতাম। তাহার ফলে, মনের বিকার উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিত। আজ তাহা বিষম-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় খাস্ কামরার আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হইল।

দেখিলাম, সাহেবের গলায় গলবন্ধ বেষ্টিত হইয়াছে, এবং পদতলে ফোমেণ্ট হইতেছে। এ দৃশ্য আমার চক্ষে নিতান্ত নূতন নহে। যদি এই ঘোরতর বর্ষার সময়েও অসুখ না হয়, তবে বিধাতার অসুখ-সৃষ্টিটাই মিথ্যা হইয়া যায়। বিশেষতঃ এই "স্যাঁত্ সেঁতে" দেশে, যে দেশে রাস্তায় টম্‌টম্ বাহির হইলেই গাড়ীর চাকা আধহাত কাদার ভিতর ডুবিয়া যায়, সেই দেশে বিনা পয়সার "কল্" আসিলে সেই সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের শরীরে রোগও আসিতে বাধ্য। অতএব বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের পীড়া এবং এ অধীনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ, এ সমস্তই পঠিত পুস্তকের চির-পরিচিত পংক্তির মত পূর্ব্ব হইতেই আমার বিদিত ছিল। সুতরাং ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না।

আমার প্রভু নাকের উপর হইতে চশ্‌মা খানি একটু ঊর্দ্ধে

তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; স্বরে ও দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কোমলতা-প্রকাশের জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার! এই পত্র পড়িয়া দেখ। কেস্ বড় কঠিন। মিস্ সেনকে লইয়া শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না; আমার শরীর যে নিতান্ত অসুস্থ, এ কথাও জানাইও। এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরের ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে, এ জন্য আজ আমি যাইতে পারিলাম না। যদি কোন পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন মনে কর, লিখিয়া পাঠাইও।"

স্মৃতির সঙ্গে 'কলে' যাইবার সুযোগ পরিত্যাগ ডাক্তার সাহেবের পক্ষে এই প্রথম। তাই আমার মনে হইল, আজিকার অসুস্থতার মূলে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক, কাল বিলম্ব না করিয়া স্মৃতির সন্ধানে চলিলাম।

হাঁসপাতালের অতি নিকটেই স্মৃতির আবাস। স্মৃতির একজন দাসী ছিল, কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় কখনই তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। দুই একবার ঘণ্টা বাজাইয়াও যখন কোনও উত্তর পাইলাম না, তখন আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া আমি পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

স্মৃতি নতজানু হইয়া কার্পেটের উপর বসিয়াছিল। হাত দু'খানি অঞ্জলি-বদ্ধ, দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। আমার উপস্থিতি সে বুঝিতেও পারিল না।

লোকের সহিত লোকের সর্ব্বদাই দেখাশুনা ও আলাপ হয়, তথাপি কেহ কাহারও পরিচয় পায় না। এতদিন আমি স্মৃতিকে

কেবল একজন ধাত্রী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আজ তাহার নূতন পরিচয় পাইলাম।

২

বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের অসুখ বাড়িয়াই চলিল; আমাকে ও স্মৃতিকে তিন রাত্রি রোগীর কক্ষে রাত্রি জাগরণ করিতে হইল।

তিন দিনের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সূর্য্যের প্রসন্ন মুখচ্ছবি প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, একটা দীর্ঘ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যেন সহসা জাগিয়া উঠিলাম। এই তিন দিনে জগতে যেন কতই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন এই তিন রাত্রির মধ্যে আমার নীরস জীবনের পরিবর্ত্তে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছি; পুরাতন জীবনের সহিত আর কোনও মতেই তাহার মিল হইতেছে না।

হাঁসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া ডায়েরী খুলিলাম। খুলিবামাত্র একখানি অর্দ্ধলিখিত পত্রে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। তিন দিন পূর্ব্বে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিতে পারি নাই। পাঁচমাস পূর্ব্বে আমি আট দিনের ছুটীতে বাড়ী গিয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলাম। পত্রখানি আমার নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি প্রথম সম্ভাষণ। ডায়েরী হইতে বাহির করিয়া পত্রখানি একবার পড়িয়া দেখিলাম, তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া তাহার অগ্নিকৃত্য সম্পন্ন করিলাম।

মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনের অস্থিরাবস্থায় ঘন ঘন পাদচারণটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি ছাদে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

নানারূপ তত্ত্বকথার মীমাংসা করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া পড়িলাম। সহসা আমার দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইয়া পদযুগলকে যেন আকর্ষণ করিয়া বাগানের দিকে লইয়া গেল।

৩

স্মৃতি ঝাউগাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল। তিনরাত্রি জাগরণের পরও এমন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যে তাহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া ঝাউগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল।

স্মৃতিরও সেইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বোধ হইল, তাহার মনে বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দের মাত্রাটাই অধিক।

ডাক্তার সাহেব সময়ে অসময়ে স্মৃতির সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেন, স্মৃতিকে তখন বড়ই অল্পভাষিণী বলিয়া বোধ হইত। আমি পূর্ব্বে কখনও তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, দূর হইতে উভয়ের সম্ভাষণ দেখিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতাম। কিন্তু এই তিনদিনে বুঝিলাম, স্মৃতি, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল বকিয়া যাইতে পারে।

স্মৃতি বলিল, "আমার বাবার সমাধির উপর ঠিক এইরকম একটা ঝাউগাছ আছে। এই ঝাউগাছটা দেখিলেই আমার সেই গাছটার কথা মনে পড়ে। আমার এখানে আসিতে বড় ভাল লাগে। বাড়ীতে আমি যখনই অবসর পাইতাম, তখনই বাবার সমাধির কাছে সেই ঝাউগাছের নীচে বসিয়া থাকিতাম।"

আমি ঝাউগাছটার দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিলাম। কি জানি, কেন বাবার সেই বিদায়কালের অশ্রু-নিরুদ্ধ দৃষ্টি সহসা মনে পড়িয়া গেল।

স্মৃতি বলিতে লাগিল, "বাবার সমাধির পাশেই আমার মার সমাধি। মার সমাধির পাশে একটী যুঁই গাছ আছে, গ্রীষ্মকালে রাশি রাশি সাদা যুঁই সাদা পাথরের উপর পড়িয়া থাকে। মায়ের কথা আমার ভাল মনে পড়ে না; তিনি যখন স্বর্গে যান, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তাঁর একখানি ক্রস্ ছিল, সেই ক্রস্ খানি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বাবা সেখানি সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন, বাবা মৃত্যুকালে সেখানি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। সেই ক্রস্ আর বাবার ছোট ফটো-খানি, বাবা ও মার স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকে।"

এই বলিয়া স্মৃতি তাহার লকেটটী খুলিয়া আমার হাতে দিল। লকেটের সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের ক্রস্ ছিল। লকেটটী খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর ছোট একখানি ফটো। সেইটী তাহার পিতার প্রতিকৃতি।

স্মৃতি তখন অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। স্মৃতির অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে অশ্রুর সঙ্গে কি মুক্তার তুলনা হইতে পারে? আমার মনে হইল, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা এই অশ্রুবিন্দু দুইটীর মূল্য অধিক।

আমি বলিলাম, "এই তিন দিনের পরিশ্রমের পর বাগানে না আসিয়া তোমার একটু বিশ্রাম করা উচিত ছিল।"

তিন দিনের মধ্যে—শিষ্টাচার অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং আত্মীয়তার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া বলিল, "বিশ্রামের কথা বল্‌ছেন? আপনি ব্যবস্থা দিতেছেন, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতেছেন না কেন?"

আমি উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই স্মৃতি আরও বলিল, "আমার বাবা দিনরাত যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, সে কথা মনে করিলে এ সামান্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে হয় না। কি আশ্চর্য্য! এত পরিশ্রমের পরেও তাঁহাকে কখনও ক্লান্ত কি বিরক্ত হইতে দেখি নাই, তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও হাস্যময় থাকিত। ধর্ম্মে তাঁহার কি শ্রদ্ধা—যীশুর প্রতি তাঁহার কি প্রবল প্রেমই ছিল।" বলিতে বলিতে স্মৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"ওঃ! সে চিঠির কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বাবার কথা মনে হইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না। আমার ধর্ম্মপিতাকে ডাক্তার সাহেবের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি আমাকে এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিতে লিখিয়াছেন।"

"চিঠি পড়িয়া তুমি কি স্থির করিলে?"

"এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। আপনি কি বলেন?"

"আমি—" বলিয়া আমি কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলাম। এই কয়েক মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্কে প্রবলবেগে এক সঙ্গে এত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল যে, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই

রকম করিয়াই মানুষ পাগল হইয়া যায়। সহসা উন্মত্তের মত স্মৃতির হাত ধরিয়া বলিলাম, "স্মৃতি, স্মৃতি, বল, আমি যদি তোমাকে জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী করিতে চাই, তাহাতে কি তুমি সম্মতি দিবে না?"

৪

আমার নিয়ম ছিল, বাবাকে নিয়ম মত দুইদিন অন্তর পত্র লিখিতাম। শত কাজের ভিড়েও এ নিয়ম চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছি। যখন মনে হইত, বাবা কত ব্যাকুলতার সহিত সেই কয়েকটী কালীর অক্ষর দেখিবার জন্য পিয়নের পথ চাহিয়া আছেন, তখন অসময়ের মধ্যেই সময় পাইতাম। কিন্তু এবার আমার দুই সপ্তাহ বাবাকে পত্র লেখা হইল না।

এই দুই সপ্তাহ যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছিল, আমি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেও, তাহা স্মরণ করিতে পারি না।

ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের ছুটী লইয়া গিয়াছেন, আমার উপরেই সমস্ত কাজের ভার ছিল। স্মৃতি সর্ব্বদা আমাকে সাবধান করিয়া না দিলে রোগীদের অবস্থা যে কি হইত, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সুখের মধ্যে এই, কাজ কর্ম্মের বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু ডেস্কের ভিতর বাবার দু'খানি চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে, সে দুখানি খুলিয়া পড়াও হয় নাই।

অনুতপ্ত চিত্তে চিঠি খুলিলাম। এমন সময়ে হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "চিঠিখানি কার?"

"আমার বাবার চিঠি।"

দেখিলাম, স্মৃতির প্রফুল্লবদনে একটু অন্ধকারচ্ছায়া পড়িল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খৃষ্টান হইলে তোমার বাবার মনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইবে।" স্মৃতি মৌখিক হাস্যে তাহার আন্তরিক বিষাদ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কেন খৃষ্টান হইব? তুমিই তো হিন্দু হইতেছ।"

স্মৃতি ভাবিতে ভাবিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হিন্দু হলে তো আর যীশুকে ভাল বাসিতে পারিব না, সে কেমন করে হবে?"

"কেন, হিন্দু হ'লে কি যীশুকে ভালবাসা যায় না? আমি তো যীশুকে কত ভালবাসি।"

"সত্য, তুমি যীশুকে ভালবাস?" বলিতে বলিতে স্মৃতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৫

পরদিন প্রত্যূষেই স্মৃতি বলিল, "কাল ভাবিতে ভাবিতে আমার সারা রাত্রি ঘুম হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "এত ভাবনা কিসের?"

"আচ্ছা আমাকে বিবাহ করিতে তোমার বাবা কি মত দিবেন? যদি তিনি মত না দেন, তুমি কেমন করিয়া তাঁর মনে কষ্ট দিয়া বিবাহ করিবে?"

একথাটা যে আমিও না ভাবিয়াছি এমন নয়; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

চিত্রপট।

স্মৃতি ডেস্কের ধারে আসিয়া বাবার চিঠিখানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, "কি সুন্দর হাতের লেখা। আমার তাঁকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি তাঁকে খুব ভাল বাসিব, খুব ভক্তি করিব, তিনি আমাকে যেমন ভাবে থাকিতে বলিবেন, সেই রকমই থাকিব। তবুও কি তিনি আমাকে ভাল বাসিবেন না?"

আমি অন্যমনস্কভাবে স্মৃতির কথাগুলি শুনিতেছিলাম, এমন সময় স্মৃতি বলিয়া উঠিল, "তিনি যে লিখেছেন, 'বধূমাতাকে আনিতে হইবে, বধূমাতা কে?"

আমি কাপুরুষ, এ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা স্মৃতিকে বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এখন আর না বলিলে চলে না।

আমি বলিলাম, "বধূমাতা কে শুনিতে চাও স্মৃতি? তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র, আমি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করি না।"

"সে কি?" বলিয়া স্মৃতি চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অতিকষ্টে বলিল, "এতদিন এ কথা কেন আমাকে বল নাই?"

আমি বলিলাম, "একবার ভ্রম করিলে আর কি তাহার সংশোধন নাই? এই সামান্য ভ্রমের জন্য কি আমার জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিব?"

স্মৃতি মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কি খেলার ঘর যে, একবার ভাঙ্গিয়া আবার গড়িবে?"

এই কথা বলিয়া স্মৃতি মৃদু পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তাহার প্রতিপদক্ষেপ যেন আমার বুকে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম না।

৬

সে দিন সমস্ত দিন স্মৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্মৃতির দাসীর নিকট শুনিলাম, তাহার মাথার যন্ত্রণা বড়ই বাড়িয়াছে, সে জন্য সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। স্মৃতির মাঝে মাঝে মাথার অসুখ হইত।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম। দীর্ঘ রাত্রি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়ি বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বদিনের মত আত প্রত্যূষেই স্মৃতির দেখা পাইলাম। কিন্তু একদিনে তাহার আকৃতিতে কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্মৃতি, মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমিয়াছে?"

স্মৃতি আমার মুখের দিকে চাহিল না। নতনেত্রে আমার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, "আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আজ আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, বলুন, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

// আমি পাষাণ, তবু চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্মৃতির হাত ধরিয়া তুলিতে সাহস হইল না। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম, "ওঠ, স্মৃতি ওঠ, তোমাকে দিব না, এমন আমার কি আছে?"

"তবে আমার কাছে এই অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সংসারী হইবেন। আর—" বলিয়া স্মৃতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার

করিয়া বলিল, "কাল আমি কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার একখানি ফটো ও একগোছা চুল আপনার কাছে আছে, ফিরাইয়া দিন। বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করেন নাই?"

আমরা এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সিঁড়ির উপরে জুতার শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই; এখন সশরীরে ডাক্তার সাহেবকে গৃহ মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলাম। সাহেব ক্রোধকুটিলনেত্রে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বলিলেন, "এ ব্যবহার অতি উত্তম।"

*   *   *   *   *

ইহার ফলে এই হইল যে, আমার বেতন চল্লিশটী মুদ্রার স্থলে রূপান্তরিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বিংশতি মুদ্রায় পরিণত হইল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

এখন বহুকষ্টে বেতন কিছু বাড়িয়াছে; সেই সঙ্গে পরিবারও বাড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর যত্নে এই সামান্য আয়েও সংসারে বিশেষ কষ্ট নাই। এখন আমার তিনটী সন্তান। স্মৃতির সহিত আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, সে এখন চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। অনেক সময় আমি একটী কথা মনে করি, "সব যায়, স্মৃতি কখনও যায় না।"

পথের দেখা।

১

ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক ছাত্র প্রতিপালন করিতেন। আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য না হওয়াতে গৃহিণীর সহিত এ বিষয়ে অনেক বিচারবিতর্ক হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ের পথ ধরিয়া বিচার করিতেন, গৃহিণীও যে অন্যায়ের পথ ধরিয়া অবিচার করিতেন, এ কথা বলিতে সাহস করা সুকঠিন। ফলটা শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইত। ন্যায়রত্ন নিজের উত্তরীয়ের অগ্রভাগে গৃহিণীর গলদশ্রুলোচন মুছাইতে মুছাইতে বলিতেন, "গৃহিণি, সংসারচিন্তা ত্যাগ কর। এ জগতে কে কার, কেবল পথের দেখা। সংসার তোমারও নয় আমারও নয়, যাঁর সংসারের ভার, তিনিই বহিবেন।"

সংসার-চিন্তা যে গৃহিণীর বড় অধিক ছিল, তাহা নয়। পতির দেবতুল্য কান্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত, সংসার-চিন্তার সেখানে স্থান বেশী ছিল না। তবে শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিনীগণ যখন তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "হ্যালা বউ, তোর আক্কেলটা কি? পণ্ডিতই না হয় পাগ্‌লা মানুষ; তা বলে তোর বুদ্ধিলোপ হ'ল নাকি? মানুষটা যে এত টাকা রোজকার করে আনে, সে কি কেবল বারভূতকে খাওয়াতে? না হ'ল তোর হাতে দু'পয়সার সংস্থান, না হ'ল তোর গায়ে দু'তোলা সোনা। শেষের উপায়

কিছু :ভাবছিস্ কি?"—এই সমস্ত উপদেশে যখন ব্রাহ্মণকন্যার সংসার-চিন্তা সহসা সচেতন হইয়া উঠিত, তখনই স্বামীর দেখা পাইলে এ বিষয়ে একটু বোঝপড়া হইত। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখা হইলে গৃহিণীর অত কথা মনে থাকিত না।

যাহা হউক, অবশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'পথের দেখা' শেষ হইয়া গেল। একদিন কোন অজানা নূতন পথে তিনি কোন্ দেশে চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি এত দিন যে সকল ছাত্রকে বিদ্যা, অন্ন ও স্নেহ দান করিয়া প্রতি-পালন করিতেছিলেন, তাহারাও 'পথের দেখা'র সার্থকতা অনুভব করিয়া যে যাহার পথ দেখিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাধের চতুষ্পাঠী শূন্য পড়িয়া রহিল। যে গৃহ ছাত্রদিগের পাঠকলরবে মুখরিত হইত, সেখানে অতি কঠিন নিস্তব্ধতা গাম্ভীর্য্যের সিংহাসনে বসিয়া নীরব ভাষায় সংসারের অনিত্যতা প্রচার করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শুভানুধ্যায়ী ও শুভানুধ্যায়িনীগণ বলিলেন, "আমরা তো তখনই বলেছিলাম, কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।"

ন্যায়রত্নতনয় রমানাথের শাস্ত্রচর্চ্চায় তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, সে গ্রাম্য ডিস্পেন্সরীতে বিনা মাহিনায় কম্পাউণ্ডারী করিত, লোকের সামান্য অসুখে চিকিৎসাও করিত। আহারের সময় ভিন্ন তাহার গৃহের সহিত সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। অতএব তাহার সংসারবুদ্ধি যে পিতা ও মাতা অপেক্ষা কোন বিষয়ে বা কোন ক্রমে অধিক হইবে, আশা করা অন্যায়।

যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেলে রমানাথ শূন্যহৃদয় লইয়া শূন্যগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল,

গৃহে তণ্ডুলমুষ্টি পর্য্যন্ত নাই। মাতা, বিধবা ভগ্নী, তাঁহার দুইটী শিশুসন্তান, শালগ্রাম শিলা এবং একটী গাভী, স্থাবর ও অস্থাবরের মধ্যে ইহাই কেবল অবশিষ্ট আছে। ধূলিশায়িনী মাতা ও ভগ্নীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, সে পুরুষ ; মাতা, ভগ্নী ও ভগ্নীর শিশু দুইটীর ভার তাহারই উপর। তখন কি জানি, কোথা হইতে সেই সপ্তদশবর্ষীয় বালকের মনে অপরিসীম সাহস ও বলের সঞ্চার হইল ; সেই সঙ্গে মনে মনে সঙ্কল্পও স্থির হইয়া গেল। তাহার পরদিনই রমানাথ বিদেশযাত্রা করিল, জননী ও ভগিনীর অশ্রু-স্রোত ও করুণ বিলাপ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

"বাছা আমার ক্ষিদে সইতে পারে না, কে তার মুখের দিকে চেয়ে দু'টী খেতে দেবে।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জননীর ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া গেল। অনিদ্র জননী সারা রাত্রি ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেন ; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "ওরে, আমি কি রাক্ষসী, পেটের দায়ে আমার দুধের বাছাকে বনবাসে দিলাম।"

এলাহাবাদে 'মিত্র মহাশয়ের' সহিত ন্যায়রত্নের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, সেই ভরসায় রমানাথ তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দারিদ্র্য যেমন আত্মীয়তা নষ্ট করে, এমন আর অন্য কিছুতেই নয় ; কাজেই এখন আত্মীয়তার আশা করা দুরাশা, দুর্দ্দশায় পড়িয়া রমানাথের এ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ হইয়াছিল। তবে এই ব্যবস্থা হইল যে, রমানাথ মিত্র-মহাশয়ের পুত্রকে দুইবেলা পড়াইবে এবং বেতনের পরিবর্ত্তে আহার পাইবে।

ইহার পর রমানাথের ভাগ্য আরও একটু প্রসন্ন হইল, এক-জন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী কাজ তাহার ভাগ্যে জুটিয়া গেল।

২

চৈত্র মাস, বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। কালটা বসন্তকালই বটে, কিন্তু আম্রমুকুলের গন্ধ, ভ্রমরঝঙ্কার কি কুহুধ্বনির কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না,—বর্ণনীয় বস্তুর মধ্যে রৌদ্র ও ধূলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মলয়সমীরণের পরিবর্ত্তে 'লু' চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

ঠিক্ এই সময় রমানাথ আতর মুঁইয়ার গলির একতলা বাড়ীখানির দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

'কড়া নাড়িলেন' না বলিয়া 'কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন,' এ কথাটার ভাবটা ঠিক বুঝা গেল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু 'আরম্ভ' 'শেষ' রূপে পরিণত হইতে যে অনেক বিলম্ব হইল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

গলির সম্মুখের দ্বিতল বাটীর জানালায় বসিয়া একটী বালিকা একমনে সেই দুয়ারের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ব্যগ্রভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহার ক্ষমতা থাকিলে সে এখনই গিয়া দরজা খুলিয়া দিত।

অবশেষে বহুক্ষণের পর দরজা খুলিল। কড়ানাড়ার শব্দ থামিয়া যে গর্জ্জন শব্দ শুনা গেল, তাহা এইরূপ—

"আর বাপু, তোমার জ্বালায় পারি না। বাবু ভাল এক আপদ জুটিয়েছ যা হোক্। দুপুর বেলা মানুষ খেটে খুটে দু'টা ভাত মুখে দিয়ে যে একটু ঘরে গিয়ে শো'বে তার যো নেই।

এই একটু শুয়েছি, আর তোমার কড়ার ঝন্‌ঝনানীতে ঘুম ভেঙ্গে মাথা ধরে গেল।"

"ঝি, আজ একটু বেশী কাজ ছিল বলে দেরী হয়ে গিয়েছে—"

"কোন্ দিন বা তোমার সকাল সকাল হয়, তাই আজ দেরী হয়ে গেছে, ভাত নিয়ে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার যে প্রাণটা গেল।"

দ্বিতলের জানালায় বসিয়া উমা এই সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। রৌদ্রক্লিষ্ট, ক্ষুধা-পিপাসায় অবসন্ন প্রবাসীর ম্লান মুখ দেখিয়া হয় তো তাহার মনে করুণা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথ ও ঝি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেও সে শূন্য দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু ঝির সুমধুর গর্জ্জন আবার শুনা গেল, এবার সুর মুদারা হইতে তারায় উঠিয়াছে।

"বিড়ালে ভাত খেয়ে গেছে, আমি তার কি কর্‌ব বাপু? নিত্যি নিত্যি কে তোমার ভাত পাহারা দেবে? মাহিনা দিয়ে ক'টা লোক রেখেছ?"

বিড়ালের এবং কাকের ভাত খাইয়া যাওয়া আজিকার নূতন ঘটনা নহে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত, এবং উমা তাহার সমস্ত ইতিহাসই জানিত।

ঝিয়ের কথা শেষ হইবার পরেই রৌদ্রক্লিষ্ট অনাহারী রমানাথ শুষ্কমুখে বাটী হইতে বাহির হইলেন, একতলা বাড়ীর দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আঙ্গুলের

ফাঁক দিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, উমা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, সে যে কাঁদিতেছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহার দিদি আসিয়া বলিলেন, "জানালায় বসে মুখ ঢেকে কি হচ্ছে? তোর সেই ছোট ছেলের ছেলেটা মারাগেছে বুঝি? তাই কাঁদ্‌ছিস্?" তখন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল।

দিদির এই সম্ভাষণে উমা যখন মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, তখন দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, সত্যই যে কাঁদ্‌ছিস্!"

৩

উমাদের বাড়ী বাঙ্গালী পাড়ায়। মধ্য দিয়া সরু সরু গলি গিয়াছে, গলির দুই পাশেই বাঙ্গালীর বাড়ী। অধিকাংশ বাঙ্গালীই বহু দিনের প্রবাসী। দেশের কথা তাঁহারা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন।

উমার পিতাও বহুদিন হইতে কর্ম্মসূত্রে এলাহাবাদ প্রবাসী হইয়াছেন। এলাহাবাদেই রমা ও উমার জন্ম হয়। পত্নী পরলোকগতা। কেবল এক পুরাতন দাসী ক্ষান্তকালীই দেশের স্মৃতির অবশিষ্টস্বরূপ ছিল।

পশ্চিমে বাঙ্গালীর মেয়ের স্বভাবটা ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত থাকে না। উমারও ছিল না।

প্রতিবাসিনী প্রবীণারা উমার নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "বাপে আর বোনে আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়ে দিয়েছে। অমন আদুরে মেয়ে শ্বশুর-ঘর ক'র্‌বে কেমন ক'রে?"

কেহ কেহ বলিতেন, "শ্বশুর ঘর কি আর ক'র্‌তে হবে? বাপ একটা ছেলে ধরে এনে বড় জামায়ের মত ঘর-জামাই করে রাখবে।"

"হোক্ বাপু, তা বলে মেয়ে ছেলের এতটা আহ্লাদ ভাল নয়। আমাদের ঘরে কি আর মেয়ে নাই?"

উমার নামে যে এই সমস্ত অপবাদ, ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সন্তানহীনা রমাসুন্দরীর হৃদয়ের যত সঞ্চিত স্নেহ, উমাই সে সমস্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সেই যে দিন উমা ও রমা মাতৃহীনা হইয়াছিল, তখন রমা আট বৎসরের বালিকা, উমার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। সেই আট বৎসর বয়সেই রমা ভগিনীর প্রতিপালন, পিতার তত্ত্বাবধান ও গৃহিণীপনার ভার—সমস্তই লইয়াছিল; সে আজ দশ বৎসরের কথা। এই দশ বৎসরের ভিতর কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত ভাঙ্গা, কত গড়া হইয়াছে, কিন্তু উমা ও রমা এক সূতায় গাঁথা দুটী ফুলের মত তেমনি স্নেহবন্ধনে বাঁধা আছে; এ স্নেহে দ্বেষ ও হিংসার ছায়া মুহূর্ত্তের জন্যও পড়িতে পায় নাই।

মায়ের কথা উমার কিছুই মনে ছিল না। হরিহর বাবুর শয়নগৃহে তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত দু'খানি খড়ম আছে, সেই খড়ম দু'খানি উমার জননী নিত্যপূজার সময় প্রত্যহ পূজা করিতেন। এখনও হরিহর বাবু স্নানান্তে একবার সেই খড়ম দু'খানির নিকট গিয়া দাঁড়ান, গৃহিণীর একখানি পুরাতন গাত্রমার্জ্জনী সেখানে সযত্নে ভাজ করা আছে, কখনও বা সেইখানি লইয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরেন। তাহার পর সেখানি ধীরে ধীরে যথাস্থানে

রাখিয়া গৃহের বাহিরে আসেন। উমা সেই খড়ম দু'খানি দেখিয়া মায়ের মুখ মনে করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মায়ের মুখ মনে করিতে গেলে তাহার দিদির সেই সদাপ্রফুল্ল মুখখানি মনে পড়িত।

দিদির উপর উমার কথায় কথায় রাগ হইত, তখন দিদিকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া মানভঞ্জন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন উমার আরও অনেক দোষ ছিল। শিশুকাল হইতে দিদি আর ক্ষান্ত ঝি ভিন্ন তাহার কোন সঙ্গী ছিল না, এজন্য সে লৌকিক লজ্জা শিক্ষা করিতে পারে নাই। বিবাহের কথায় যে কেন লজ্জা করিতে হয়, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কোনমতেই প্রবেশ করিত না। কাজেই প্রতিবাসিনী রমণীরা নাক তুলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, "মেয়েটা কি বেহায়া!"

৪

নাতির শোকে উমা জানালায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এ সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। পিতার আহ্বানে উমা ঘরের কোণে লুকাইলে, রমা তাহাকে পিতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিতা তাহাদের খেলিবার সঙ্গী, তাই পিতার নিকট তাহাদের কোন ভয় কি লজ্জা ছিল না আজ সহসা উমাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া হরিহর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "রমা একটা নূতন খবর শোন্, বুলবুলি রাণীর আজকাল লজ্জা হয়েছে।" তাহার পরে দুই হাতে উমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রমা উমার বিয়ে তো আর না দিলে নয়।"

রমা হাসিয়া বলিল, "এই যে বলেছিলে উমার বিয়ে দেবে না!"

"দিতে তো এখনও ইচ্ছা নাই—" বলিয়া হরিহর বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। খড়ম দু'খানির নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, হয়ত সেই দু'খানি কাষ্ঠপাদুকায় কত ভক্তি, কত প্রীতি, কত স্নেহ ও সেবার ইতিহাস লিখিত ছিল, হরিহর বাবু প্রতিদিন তাহাই পাঠ করিতেন, নহিলে খড়মের গায়ে এমন কিছু কারুকার্য্য ছিল না যে, প্রতিদিন দেখিয়াও তবু দেখা শেষ হয় না।

রমা সন্ধ্যা দিবার জন্য ঘরের দুয়ারে আসিয়া খড়মের কাছে পিতাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া ফিরিয়া গেল, তাহার আর ঘরে প্রদীপ দেওয়া হইল না। ফিরিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া সে রন্ধনগৃহের দুয়ারে বসিয়া পড়িল, মায়ের কথা মনে পড়িয়া সহসা তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল।

দিদিকে রান্নাঘরের দুয়ারে বসিতে দেখিয়া উমা আসিয়া তাহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, কিন্তু দিদি যে চুপ করিয়া আছে, ইহা তাহার কিছুতেই ভাল লাগিল না। এমন সময় দিদির এক ফোঁটা চোখের জল তাহার হাতের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল।

"একি দিদি, তুই কাঁদছিস্ কেন?"

দিদির প্রতি উমার এই অযথা 'তুই' সম্বোধনের জন্য সে অনেকের নিকট অনেকবার তিরস্কৃত হইয়াছে, অবশেষে একবার উমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে দিদিকে আর 'তুই' বলিবে

না—এবার হইতে 'তুমি' বলিবে। কিন্তু যখন সে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে গেল, তখন তাহার বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও দিদি, দিদিরে, তোকে যে আমি 'তুমি' বল্‌তে পারিনেরে।"

উমার কথার উত্তরে দিদি হাসিয়া বলিল, "তুই কেন দুপুর বেলায় কাঁদছিলি ?"

উমা অনুনয় করিয়া বলিল, "না দিদি, তোর পায়ে পড়ি, কি হয়েছে ?"

রমা বলিল, "তোর 'মুখুয্যে মশায়' বকেচেন।"

উমা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল। এ কথাটা এত অসম্ভব যে, তাহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। সে নিশ্চয়ই জানিত, 'মুখুয্যে মশায়' দিদিকে কখনই বকিবেন না, বরং দিদিই সুবিধা পাইলে তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না।

তখন দিদি বলিলেন, "কাঁদছি কেন জানিস্, তোর বিয়ে হবে, তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি তাই।"

উমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেখিয়া দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মেয়েটার হ'ল কি ?"

৫

জানালার উপর উমা তাহার পুতুলের ঘর সাজাইয়া রাখিয়া-ছিল। সেখানে প্রতিদিন কতই যে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ঘটিত তাহার ঠিক নাই।

উমার বাড়ীতে নানারূপ ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার বাবার নিমন্ত্রণ

হইত, দিদির নিমন্ত্রণ হইত, ক্ষান্ত ঝিও বাদ যাইত না। কিন্তু আজকাল তাহার পুতুলগুলি অষ্টপ্রহর লেপমুড়ি দিয়া ঘুমায়, আর সে সমস্ত দুপুরবেলা কাঠের গরাদের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। রমা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উপন্যাস হাতে লইয়া মাদুর বিছাইয়া শয়ন করে, দুই চারি ছত্র পড়িতে না পড়িতে ঘুমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসে। নীচের উঠান হইতে ক্ষান্তকালীর বাসনের ঝন্ ঝন্ ও ঝাঁটার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোথাও একটু খট্ খট্ শব্দ হইলেই উমা কড়ানাড়ার শব্দ মনে করিয়া চমকিয়া উঠে।

গলিটীতে বেশী লোকের চলাফিরা নাই। হয়তো কখন একটা চুড়িওয়ালা 'বেলোয়ারী চুড়ি' হাঁকিয়া যায়, হয়তো দু'টী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে চলিয়াছে, হয়তো দুটী তিনটী ছেলে একসঙ্গে গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল, তাহার মধ্যে কখন যে একটী লোক আসিয়া সম্মুখের দুয়ারে দাঁড়াইবে, সেই প্রত্যাশায় উমা একাগ্রমনে পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে থাকে, ততই তাহার মনের অস্থির-তাও বাড়িতে থাকে। এত বেলায় লোকের কতই ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইতে পারে, মনে ক্রমাগত এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে হয় তো বেলা হওয়ার জন্য ঝি আজ কতই বকিবে,—হয় তো এতক্ষণ বিড়ালে ভাত খাইয়া গিয়াছে,—এই সমস্ত ভাবনায় ভয়ের সঞ্চার হয়। রমানাথের আহার শেষ হইয়া

গিয়াছে, অনুমানে বুঝিতে পারিলে উমার সে দিনটী সার্থক মনে হইত।

উমা যে এমন দিনদিন ধ্যানে তন্ময় হইয়া তপস্বিনী হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাহার নিরীহ দিদি কোন ক্রমেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন নাই। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটীর পর তিনি সুস্থচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বোনটীকে চুল বাঁধিতে ডাকিতে আসিতেন এবং উমার বাড়ীতে অনেকদিন কোন ক্রিয়াকর্ম্ম না হওয়ার জন্যও কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতেন।

উমার এই প্রাত্যহিক ধ্যান একরূপ নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছিল। সহসা তাহার মধ্যে বিবাহের কথা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। এই বাতায়নখানির সঙ্গে যদি কেহ তাহার বিবাহ দিত, তাহাতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না।

রাত্রে ক্ষান্ত তাহাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, উমা বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দেখিবামাত্র ক্ষান্তর হৃদয়ে যে ভাবপ্রবাহ উপস্থিত হইল, তাহা কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হইয়া তড়িদ্‌বেগে রন্ধনগৃহ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইল, অতএব রমা রন্ধনগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ শয়নগৃহে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন।

রমা বিছানার পাশে গিয়া অশ্রুজলপ্লাবিতা উমাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "পাগ্‌লি, সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে যে চোখ রাঙ্গা কল্লি। হয়েছে কি তোর?"

উমা দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবাকে বোলো আমি বিয়ে করব না।"

৬

কিন্তু পরদিনই হরিহর বাবু একটী বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিলেন। ছেলের বাপের পাটের কারবার আছে, সম্পত্তিও বিস্তর। বাপের একমাত্র ছেলে, ছেলেটী এলে পড়িতেছে। উমা যখন তাহার পিসীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, তখন পাত্রের পিতা তাহাকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহার মেয়েটীকে অতিশয় পছন্দ হইয়াছে, বৈশাখমাসের প্রথমেই তিনি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন।

হরিহর বাবু রমার নিকট শুভসংবাদ দিতে গিয়া গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষান্ত এই সংবাদ শুনিয়া এতই আনন্দিতা হইল যে, তৎক্ষণাৎ হরির লুঠ দিবার জন্য বাতাসা কিনিতে বাজারের অভিমুখে প্রস্থান করিল, অগত্যা তাহার অবশিষ্ট কাজগুলি রমাকে করিতে হইল।

সেদিন বাসন্তী দেবীর অষ্টমী-পূজা, আফিসের ছুটী ছিল, হরিহর বাবু জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহের বাজার করিতে গেলেন।

রমা কাজ সারিয়া উমার নিকট আসিয়া বলিল, "বুলুবুলি, জান্‌লায় কি তোকে পেয়ে বস্‌ল নাকি। আয় চুল বেঁধে দি'।"

সম্মুখের বাড়ীতে সজোরে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

রমা বলিল, "এবার যে মিত্তিররা খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজো কর্‌ছে; আর বছর, পেলেগের যে মহামারী গিয়াছে, সেই জন্য উদ্যাপন করিতে পারেনি। এবার বোধ হয় উদ্যাপন হবে।"

বলিদানের বাজ্‌না কাণে যাইবামাত্র উমার মনে একটী ভীত, কাতর, আর্ত্ত ছাগবৎসের চিত্র উদিত হইল। গত বৎসর উমা

যে বলিদানের দৃশ্য দেখিয়াছিল,—চারিদিকে লোকের কোলাহল, তাহার মধ্যে স্নাত জবামাল্য-পরিহিত সিন্দূরচর্চ্চিত উৎসর্গীকৃত ছাগ-বৎসটীকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হইয়াছে। সে এত ভয় পাইয়াছে যে, 'মা' বলিয়া ডাকিতেও পারিতেছে না, কেবল অতি করুণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছে, সেই চাহনি দেখিয়া উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সকলে তখন তাহাকে কত নিন্দাই করিয়াছিল, বাবা তখন তাহাকে কত আদর করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথাই উমার মনে পড়িয়া গেল। সে দিদির কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "দিদি, মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? এই পূজা নিয়ে কি দেবতা প্রসন্ন হবেন?"

দিদি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নাই।"

ক্ষান্তর হরির লুঠ দেওয়া শেষ হইলে সে প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইল। উমা রাজরাণী হইবে—ইহা যে ক্ষান্ত চক্ষে দেখিবে, এত সুখ যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, এই চিন্তায় তাহার রোদন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

উমা দিদির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি, বাবা বুঝি আমাকেও সিঁদূর মাখিয়ে বলি দেবেন?"

৭

রমা পিতার নিকট গিয়া বলিল, "জ্বরটা বলির বাজনা শুনে ভয় পেয়েই হ'য়েছে, নহিলে এত প্রলাপ বকবে কেন? যাহোক বাবা, তুমি একবার ডাক্তার জ্যাঠাকে ডাক্‌তে পাঠাও।"

কিছুক্ষণ পরে হরিহর বাবু ডাক্তার বাবু ও তাঁহার কম্পা-উণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন।

ডাক্তার বাবুর সহিত এ পরিবারের বহুদিনের সম্বন্ধ, তিনি উমা ও রমাকে ছেলেবেলা কোলে করিয়াছেন, তাঁহার নিকট রমার কোনই সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ও ছেলেটী বড় ভাল, শুন্‌লাম জ্বরটা বেশী, যদি তাড়াতাড়ি কোন ঔষধ আনাতে হয়, তাই ওকে সঙ্গে করে এনেছি। ওকে দেখে কিছু লজ্জা কর্‌তে হবে না।"

উমা শুষ্ক লতার মত বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহার জ্বরক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথের প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

উমা তখন প্রলাপ বকিতেছিল, "দিদি, তু'টো যে বেজে গেল, এখনও কেন কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে না? এত বেলায় মানুষের কত ক্ষিধে পায় বল দেখি। এলে পরেই আবার ঝি কত বক্‌বে।"

রমা উমার মুখের উপর মুখ নত করিয়া বলিল, "উমা, উমা, কি বল্‌ছিস?" তাহার পর ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সমস্ত রাতই এম্‌নি বকেছে। বোধ হয়, ভয় পে'য়ে জ্বরটা হয়েছে, তাই এত বক্‌ছে।"

ডাক্তার বাবু হরিহর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "এত বেশী ব্যস্ত হইবেন না।"

উমা সহসা বিছানায় উঠিয়া বসিল, বলিল, "দিদি, দেখ্, দেখ্, জানলায় গিয়ে দেখ্, ওই বুঝি কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে।"

রমা অশ্রু মুছিয়া বলিল, "জ্যাঠামহাশয়, জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে? সমস্ত দিন জান্‌লায় থেকেই বুলবুলি অসুখটা বাধালে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "জান্‌লাটা দেখি?" বলিয়া জান্‌লার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমানাথ ও হরিহর বাবুও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা, ভয় পাওয়ার কথা বল্‌ছিলে, ভয় পাওয়ার কারণটা কি?"

"মিত্র বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছিল, বুলবুলি জান্‌লায় বসে' বলিদানের বাজনা শুনেছিল।"

"মিত্র বাড়ী? ওঃ! রমানাথ, এই বাড়ীতেই তুমি থাক না?"

রমানাথ মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উমার প্রলাপের সমস্ত অর্থই এখন তাহার নিকট অতিশয় স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "বুল্‌বুলি কি সমস্ত দিন এই জান্‌লায় থাকৃত?"

"সমস্ত দুপুর এই জান্‌লায় বসে খেলা করত।"

"ওঃ, গলিটা কি কদর্য্য। এই গলির দূষিত বাতাসেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে—" বলিয়া ডাক্তার বাবু হরিহর বাবুর হাত ধরিয়া পাশের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হরিহর বাবু অবসন্ন ভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রোগটা কি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে?"

ডাক্তার কিছুক্ষণ :নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর শান্ত-স্বরে বলিলেন, "বিপদের সময় অধৈর্য্য হওয়া পুরুষের উচিত নয়। জ্বর অতি কঠিন, বিকারে পরিণত হইয়াছে, প্লেগ হইলেও হইতে পারে। তবে এখন অবধি নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা যায় নাই।"

* * * *

মিত্র বাড়ী হইতে সজোরে অন্নপূর্ণার বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল; গলিতে একটা ছেলে গাহিতে গাহিতে যাইতে-ছিল,—

"শুধু পথের দেখা দু'দণ্ডেরি তরে।"

—

পুরাণো ডায়েরী।

১৫ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার। আজ তৃতীয়া তিথি, পালামৌ আসিবার পর আজ বিশেষ করিয়া বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছে, কেন না, বাড়ী হইতে যেদিন আসি, সেদিনও শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। আজ বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে আসীন হইয়া কম্বল জড়াইয়া যেমন একদৃষ্টে রেখা-চাঁদখানিকে দেখিতেছি, সেদিনও ট্রেণ হইতে এই রকমই দেখিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশীক্ষণ দেখা হইল না, কেন না, জ্বর আসিয়া পড়িল। ওঃ! সেদিন ট্রেণে যে ভিড়, সে ভিড়ের কথা সহজে ভুলিতে পারিব না। সে দিনের বাষ্পরথযাত্রা জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা। আচ্ছা, মহাপূজার সময় পশ্চিমের গাড়ীতে বাঙ্গালী-যাত্রীর এত আধিক্য কেন? এটা আমার কাছে কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইয়াছে। আমিই না হয় মূর্খের মত গৃহাগতা মহামায়ার চরণপূজা অপেক্ষা সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে বসিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক ধ্যানটাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছি; কিন্তু তাহা বলিয়া সকলেই যে আমার মত মূর্খ হইবে, এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না। পূজার সময় দেশ ছাড়া—বাড়ী ছাড়া হওয়া যে কত কষ্ট, আমি সে বিষয়টী খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। আমার এ ডায়েরী দেখিলে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবিবে; কিন্তু সত্য কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, ষষ্ঠীর দিন সকালে উঠিয়া যখন প্রথমে আলোর মুখ দেখিলাম, তখন প্রাণের ভিতর শোকের মেঘ যেন অন্ধকার করিয়া আসিল। সত্যই শোকের মেঘ!

যখন মনে হইল, বাড়ীতে এতক্ষণ বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন পুরুষ হইয়াও স্ত্রীলোকের মত চোখের জল ফেলিয়াছি, সোজা কথায় বলিতে গেলে, ঝাড়া আধঘণ্টা কাঁদিয়াছি। সেই যে উঠানে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, সে কি আনন্দ, কি আনন্দ! সে আনন্দ কি বুঝান যায়? আর মনে পড়ে,—সেই বিজয়ার কোলাকুলি! এখানে কোলাকুলি করিবার লোকই খুঁজিয়া পাই না। বন্ধুবর সাহেবী মেজাজের লোক, তাহাতে আবার হাকিম মানুষ। অষ্টপ্রহর প্যাণ্ট্ কোট্ লইয়া যাঁহার কারবার, তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি বড় সুবিধা হয় না; তা বলিয়া আমি ছাড়িবার পাত্রও নই। তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াছিলাম, আর তাঁর তিন বছরের মেয়ে কুন্দর সঙ্গে খুব ভাল করিয়া কোলাকুলি করিয়াছিলাম, তা ছাড়া দু'একজন 'সেইয়া-মেইয়া' যাহাকে পাইয়াছিলাম, তাহারই সহিত কোলাকুলি করিয়াছি। সেদিন কি মনে হয় না যে, আজ যাকে কাছে পাই, তাকেই কোল দিই, যে কাছে আসে, তাকেই বুকে ধরি। মা, বিদায়ের দিনে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কি ভালবাসার বাঁধনেই মিলিয়ে দিয়ে যান! সেদিন আমাদের কি শুভদিন, মহা-মিলনের দিন! সে দিন কি আর হাড়ি ডোম বলে ঘৃণা হয়? ধনী দরিদ্রের পার্থক্যে কোন সঙ্কোচ মনে আসে, না শত্রুকে শত্রু বলে মনে হয়? বৎসরের ভিতর একটী দিন! তা হোক্, সেই একদিনেই আমাদের সমস্ত বৎসরটা সার্থক হয়। সেই একদিনেই সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান, সেই একদিনেই মিলনের ভিতর সমস্ত বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি!

আর একদিন কাল গিয়াছে। ভাই-দ্বিতীয়ার দিন! কাল

সরযূ আমাকে ফোঁটা দিয়া ছিল। সরযূ আমার আশ্রয়দাতা গৃহকর্ত্তা বন্ধুবর প্র—র সকলের ছোট বোন। (N. B প্র—র সম্বন্ধে মান্য ক'রে অনেকটা বিশেষণ জুড়ে দেওয়া গেল।) গত বৎসর তাহার বিবাহের সময় এত ঘটা হইয়াছিল যে, তার বিবরণ লিখ্‌তে আমার ডায়েরীর সম্পূর্ণ আটটী পৃষ্ঠা ভরে গিয়েছিল। মেয়েটী দেখ্‌তে ভারি সুন্দর। এমন কালো চুল, এমন সুন্দর ভ্রূ, আর এমন বড় বড় কালো চোখ! আমার দেখ্‌তে ভারি ভাল লাগে। কিন্তু সে এমন লাজুক যে, আমি একমাস হ'ল এসেছি, তার মধ্যে কাল কেবল আমার সম্মুখে এসেছিল। চন্দনের বাটীতে আঙ্গুল ডুবিয়ে সে যখন বিড়্ বিড় ক'রে

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়্‌লো কাঁটা।"

ব'লে আমার কপালে ফোঁটা দিলে, তখনই আমার মিনি পাগ্‌লীর কথা মনে পড়ে গেল। মিনিতে আর এতে কই আমিতো কিছু তফাৎ দেখ্‌তে পাই না, সে একটা মিনি আর একটা মিনি। সে না হয়, মিনি পাগ্‌লী, আর এ না হয় সরযু পাগ্‌লী। সে দুড়্‌দাড়্ করে এসে "দাদা, দাদা" করে ডেকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে তোলে, এ আবার আর এক রকম, ভুঁয়ে পা পড়ে কিনা পড়ে, আস্তে আস্তে চলে, আর লজ্জায় কারুর দিকে চোখ তুলে চাইতেই পারে না। এই রকম কত ধরণের কত যে পাগ্‌লী আছে, তার ঠিকানা নাই। ওই যে রাস্তা দিয়ে হিন্দুস্থানীর মেয়েটী চুব্‌ড়ী মাথায় করে চলে যাচ্চে, ওটীও মিনিরই আর এক মূর্ত্তি, বুধিয়া পাগ্‌লা কি দুলিয়া পাগ্‌লী, এই রকম একটা

কিছু হবে ; ও যখন বাড়ী গিয়ে মাথার চুব্‌ড়ি ফেলে "ভাইয়া হো !" ব'লে ওর ভাইকে ডাক্‌বে, তখন দেখ্‌লেই মনে হবে, মিনি আর কোথায় আছে !

আমার সকলের সঙ্গেই "ভাব" করিতে ইচ্ছা করে, "আড়ি"টা ভারী অপছন্দ জিনিস। হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে যদি হিন্দুস্থানী হয়ে মিশে যেতে পারি, কোলেদের সঙ্গে, সাঁওতালদের সঙ্গে যদি ভারী একটা বন্ধুত্ব করে ফেল্‌তে পারি, সে কেমন সুন্দর হয় ! কিন্তু সেপক্ষে একটী বাধা,—সে বিষম বাধা ! সে বাধাটী হচ্ছে আমার ভাষাজ্ঞানের অল্পতা। বাস্তবিক নিজের মূর্খতা দেখে নিজের উপর বিষম রাগ ধরে যায় ! প্র—কেমন হিন্দুস্থানী ভাষায় অনর্গল কথা বলে যায়, যেন সে সেই দেশেই জন্মেছে ! কিন্তু আমার কি দুর্দ্দশা, একটা কথা যদি অনেক কষ্টে জুটাইয়া আনি, তবে তাহার সঙ্গে জোড়া দিবার মত আর একটী খুঁজিয়া পাই না। যদি বা দ্বিতীয় শব্দটীও অনেক কষ্টে মিলাইয়া তুলি, তৃতীয়টীর বেলায় তো একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

আজ কোর্ট খুলিয়াছে, কাজেই বন্ধুবর ধড়াচূড়া পরিয়া আদালত-তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। আমি সমস্ত দিন কাব্য-পাঠেই সময় কাটাইয়াছি, আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাই ক্রমাগত মনে পড়িতেছিল,—

"শাম্‌লা বাঁধিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটীত্ব
একা পড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।"

১৭ই কার্ত্তিক, শুক্রবার। আজ সকাল থেকে একটু একটু মেঘ করিয়াছে, সেজন্য শীতটা কিছু কম বোধ হইতেছে।

আজ কোর্টে গিয়াছিলাম, সমস্ত দিনটা কেবল "হাজির হো" চীৎকার, সওয়াল-জবাব, জেরা, বাদ-প্রতিবাদ, আর লোকের ভিড়। মনটা আজ ভারী শ্রান্ত, যেন তার উপর একটী প্রকাণ্ড ভার চাপিয়া আছে। বন্ধুবর নবীন ডেপুটী, তাঁহার বিচার-পদ্ধতি দেখে, তিনি যে শীঘ্রই প্রমোসন্ পাইবেন, এ অনুমান মাথায় আসা আশ্চর্য্য নয়। আমি যদি ডেপুটী হইতাম, তা'হলে কিরকম বিচারপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতাম, তা এখন ঠিক্ করে বল্‌তে পারি না। হয় তো সোনার কাঠি ছুঁয়ে রাজকন্যা যেমন জেগে উঠ্‌তো, আমার নির্জীব বিচার-বুদ্ধিও তেমনি ডেপুটীর আসনে উপবেশনের ফলেই সজাগ হয়ে উঠ্‌তো।

একটা বিচারের দৃষ্টান্ত ডায়েরীর পাতায় লিখে রাখ্‌বো। চুরি করা অপরাধে ডুল্‌হা মাঝির একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। চুরিটা পকেটকাটাও নয়, সিঁধ-কাটাও নয়, রাস্তা দিয়ে গমের গাড়ী চলে যাচ্ছিল, ডুল্‌হা তার পিছনে ছিল। বস্তার ফুটো দিকে গম রাস্তায় পড়্‌ছিল, ডুল্‌হা তাই কুড়িয়ে কোঁচড় বোঝাই করেছে, এই তার অপরাধ। এখন কথা হচ্ছে, বস্তায় ফুটো হ'ল কি করে? গাড়োয়ান বলে—তার বস্তায় ফুটো ছিল না, ফুটো থাক্‌লে কি আর এত পথ গম পড়্‌তো না? ডুল্‌হাই দুষ্টামী ক'রে বস্তায় ফুটো করে দিয়েছে। ডুল্‌হাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ডুল্‌হা বলিল—সে ইচ্ছা করিয়া ফুটো করে নাই, তবে তাহার হাতে টাঙ্গী ছিল, টাঙ্গীর গুঁতো লাগিয়া ছিদ্র হইতে পারে। বেচারী সাঁওতাল,

মিথ্যা কথা বলা তার অভ্যাস নাই, মিথ্যা বলিতে গেলেও সত্য কথাই বলিয়া ফেলে। যখন তাহাকে আদালত হইতে প্রশ্ন করা হইল—“অন্যের গম জানিয়াও সে কেন লইতেছিল,” তখন ডুল্‌হা উত্তর দিল, “চার রোজ হইতে তার ঘরে দানা নাই।” এই উত্তর শুনিয়া আদালতে একটা হাসির ধ্বনি উঠেছিল। হাসিবার কথাই বটে। তোমার ঘরে দানা নাই বলিয়াই কি তুমি পরের ঘরে সিঁধ দিবে?

আমার মনের ভাবটা আমি যে ডায়েরীর পাতায় কালীর অক্ষরে ঠিক বসিয়ে যাব, এমন ক্ষমতা আমার নাই। তবে এক কথায় বল্‌তে পারি, আমার মনে বড় আঘাত লেগেছিল। কেন আঘাত লেগেছিল, এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। চুরি করে চোর দণ্ড পাবে, এটাতো সমাজ-রক্ষার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তাতে দুঃখ করা অনুচিত। আমি জানিনে যে, তা নয়, কিন্তু সব চুরিই কি একরকমের চুরি? চুরি কর্‌লেই সে চোর, কেন চুরি করেছিল, তার খবর আর কে রাখে?

সকলেই বলাবলি কর্‌ছিল, ডুল্‌হা বড় দাঙ্গাবাজ, বড় অহ-ঙ্কারী। আমি সব কথা ভাল করে বুঝতে পারিনি, সওয়াল-জবাব বুঝা আমার অসাধ্য; তবে কতক অনুমানে, কতক জিজ্ঞাসা করে, এইটুকু মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝে নিয়েছিলাম। আমি একবার অপরাধীর মুখের দিকে ভাল করে চাহিয়া দেখিলাম। দীর্ঘদেহ সাঁওতাল, সম্ভবতঃ এককালে খুব বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন বোধ হয়, অন্নাভাবেই শরীর নিতান্ত জীর্ণ হয়ে গিয়াছে। পিঠের মেরু-দণ্ডও একটু বাঁকিয়াছে। শীর্ণ মুখের ভিতর বড় বড় চোখ দুটী,

তাহার উপর কি হুকুম হয় শুন্‌বার জন্য, যেন আশঙ্কা আর উদ্বেগে জ্বল্‌ছিল। সেই চোখের চাহনিতেই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, 'আমার ঘরে দানা নাই,' সেই দৃষ্টি আমার প্রাণের ভিতর গিয়ে ছুরির মত আঘাত করিতে লাগিল। আমি আর সে চোখের সম্মুখ থেকে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না, কেবলই আমার চোখের উপর তার সেই শিরা-বহুল দীর্ঘ শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বিবর্ণ ম্লানমুখ ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো, তার সমস্ত আকৃতিটাতেই যেন লেখা ছিল, 'আমার ঘরে দানা নাই'। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, তার একমাস কারাবাসের হুকুম হইল, তখন একমুহূর্ত্তের জন্য তাহার রক্ত-শূন্য বিবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে সজোরে তাহার দুই হাত মুঠা করিয়া ধরিল, রক্তবর্ণ চোখে বিচারপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে মুঠাবাঁধা দুই হাত একবার উপর দিকে তুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া তাহার জাতীয় ভাষায় কি যেন বলিল, তাহার একবর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি আর বেশীক্ষণ আদালতে না থাকিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

দুল্‌হা মাঝি আজ যেন ভূতের মত আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। যতই বই খুলি, যতই পাতা উল্টাই কেবল সেই চেহারাই মনে আসে। চেহারাটা ঠিক্ যেন মূর্ত্তিমান্ নৈরাশ্যের মূর্ত্তি। একমাস জেলের হুকুম তো আর ফাঁসির হুকুম নয়, তবে ওর অতটা নিরাশ হবার কারণ কি? কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মুক্ত বাতাসে আকাশের নীচে ইচ্ছামত আহার-বিহার, শয়ন-ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে বন্দিত্বের কষ্ট কি অনুভব করা যায়?

একা-একা কি করা যায়, মনটা বড় অস্থির হইয়া উঠ্ছে, মালী গিরিধারীলাল ফুলের তোড়া লইয়া আসিল দেখিয়া, তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি আমার স্ব-রচিত ভাষায় কথাবার্ত্তা চালাইলাম, গিরিধারী অবশ্য তাহার দেশীয় ভাষাতেই উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু সে কথাগুলি তো আর আমার মুখস্থ হয় নাই, কাজেই আমি আমার দেশীয় ভাষাতেই তাহা ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিব।

"আচ্ছা গিরিধারী, তোমার কয়টী লেড়্কা-লেড়্কী!" আমার প্রশ্ন শুনিয়া গিরিধারী ভারী খুসী; আমি দেখেছি, লেড়্কা-লেড়্কীর কথা তুলিলেই লোকের সঙ্গে খুব শীঘ্র বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে।

গিরিধারী তোড়াটী টেবিলের উপর ফুলদানীতে রাখিয়া ম্যাটিংএর উপর আসন গ্রহণ করিল; বলিল, "বাবু সাহেব, আমার তিন লেড়্কা, আর দুটী লেড়্কী ছিল, এখন ভগবানজী কেবল তিনটীকে রাখিয়াছেন!"

প্রশ্নোত্তরে ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধা মা, একটী ছোট বোন ও একটী ভাই আছে; ভাই পুরুলিয়ায় সাহেবের নিকট কর্ম্ম করে, ইত্যাদি সমস্ত সংবাদই জানিয়া লইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মাহিনা তো ছয়টী টাকা, এবার যেমন অজন্মা, তাহাতে তোমাদের কি করিয়া চলে?"

আমার প্রশ্নে গিরিধারী ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিল যে, তাহারা গমের রুটী খাইতে পায় না, মাড়ুয়া খোসাশুদ্ধ পিসিয়া তাহারই রুটী খায়, জমীতে কিছু মাড়ুয়া হয়, আর ভাইয়া মাসে মাসে দুটী টাকা পাঠাইয়া দেয়।

চিত্রপট।

গিরিধারীলালের বাড়ী এখান হইতে কিছু দূর “দেহাত” অর্থাৎ পল্লীগ্রামে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি দুল্‌হা মাঝিকে চেন?”

গিরিধারীলাল বলিল, “তাহার বাড়ীর নিকটেই দুল্‌হার বাড়ী। দুল্‌হার স্ত্রী আর দু'টী ছেলে আছে।”

ক্রমশঃ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, দুল্‌হার স্ত্রী গ্রামেরই মেয়ে, খুব খাপ্‌সুরৎ অর্থাৎ সুন্দরী এবং তাহার স্বভাব বড় ভাল। সে প্রায় একমাস পীড়িত অবস্থায় শয্যাগত আছে।

আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, “ছেলে দুটীকে দেখে কে?”

গিরিধারীলাল উত্তর দিল, “ভগবানজী!”

সন্ধ্যার পর বন্ধুবরের সঙ্গেও দুল্‌হার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুবর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ দুল্‌হা মাঝিকে দেখেছিলে? বেটা ডাকাত, উহার অসাধ্য কিছু নাই। যে রকম সাপের মত গজ্‌রাতে লাগ্‌লো, আমার ভয় হচ্ছে, জেল থেকে ফিরে এসে আমার বাঙ্‌লায় আগুন না ধরিয়ে দেয়।”

আমি বলিলাম, “তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। তোমরা অপরাধের সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা কর কিনা জানি না, কিন্তু বাড়াইয়া তোল্‌ ইহা নিশ্চয়।”

প্র—বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “কিসে? অপরাধ করিয়া দণ্ড না পাইলেই অপরাধীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে, বুদ্ধ-দেবের কি এইরূপ মত?”

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, “বিচারপতি মহাশয়, প্রথমে জানিতে চাই, চুরি করা কাহাকে বলে?”

"কেন? ছেলেবেলার পড়া একেবারেই ভুলিয়াছ? না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।"

"আর জোর করিয়া পরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে কি হয়?"

"ডাকাতি।"

আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ন্যায়-দণ্ডধারক, আমার একটী প্রশ্ন মীমাংসা করুন। রোজ রোজ যে ছাগলের ছানা-গুলিকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া রসনা-তৃপ্তির জন্য বলি দেওয়া হয়, এটা কোন্ ধারার ভিতর পড়ে? মায়ের কি ছেলের উপর দাবী নাই, না ওই বেচারা বাচ্চাগুলির নিজের প্রাণের উপরও অধিকার নাই? আপনার আইন-গ্রন্থ খুলিয়া একবার অনুগ্রহ করিয়া অধিকার-তত্ত্বটা দেখিবেন কি? এই রকম আত্মস্বার্থের জন্য জোর করিয়া পরের প্রাণ কাড়িয়া লওয়াকে —কি বলা যাইতে পারে, চুরি না ডাকাতি?"

ডেপুটী সাহেব শুনিয়া এত জোর হাসিলেন যে, কুন্দ ব্যাপার কি জানিবার জন্য পর্দ্দা ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিল। হাস্যবেগ কিছু মন্দীভূত হইলে, বলিলেন, "সাধে বলি বুদ্ধদেব! কিন্তু তুমি যে দেখ্‌ছি আদালত থেকে একেবারে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এসে পড়্‌লে! এ সব বিষয়ে বিধান দিতে আমার সাহস নাই।"

১৮ই কার্ত্তিক, শনিবার। দুই দিন থেকে আমার শরীরটা কিছু অসুস্থ বোধ হচ্ছিল। কাল রাত্রে মাথার ভারী যন্ত্রণা হয়েছে। বন্ধু বলেন, "ওসব কিছুই নয়, তোমার স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুর উত্তেজনা কিছু অতিরিক্ত।" তাহা আমিও অস্বীকার করি না। স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যের জন্যই হোক্ বা যে জন্যই হোক সকালে একটু

জ্বর হয়েছিল, পালামৌ আসিবার পর আর আমার জ্বর হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা শয্যাগত ছিলাম, অবশেষে স্নায়ুর উত্তেজনায় শয্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। বাড়ীর কাছেই একটী ছোট নদী আছে, নদীর নাম কৈল নদী। নদীর ধারে—নদীর ভিতরে যে কত বর্ণের, কত আকারের ছোট বড় সুন্দর সুন্দর পাথর আছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত নানা গঠনের চিত্রবিচিত্র পাথরের উপর দিয়া নদীর স্বচ্ছ-ধারা বহিয়া যায়। আমি এই ছোট নদীটীকে বড়ই ভালবাসি। পালামৌ ছাড়িয়া যাইবার সময় আমার নিশ্চয় এই নদীটীর জন্য প্রাণ কেমন করিবে।

নদীর ধারে প্রায় আধ ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, তাহার পর দূরে একটী চলিষ্ণু বংশছত্র দেখিয়া বুঝিলাম, বাগানের মালী গিরিধারীলাল কূর্ম্মী আসিতেছে। গিরিধারীলাল নিকটে আসিয়া আমাকে রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, বলিল, "বাবু সাহেব, আজ আপনার জীউ আচ্ছা নাই, তবে ধূপে বসিয়া আছেন কেন?" আমি বুঝিলাম, আমার সঙ্গে গিরিধারীর বন্ধুত্ব ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আজ আর তাহার কিছু বিশেষ কাজ নাই বলিয়া সে একবেলার ছুটি নিয়া বাড়ী যাইতেছে। আমি বলিলাম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, ডুলহা মাঝির ঘর আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।" তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবার ভরসাও দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া সে যেন চম্‌কিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিল। তাহার পর "বড় ধূপ,"

"সে স্থান এখান হইতে অনেক দূর" ইত্যাদি নানা আপত্তি করিতে আরম্ভ করিল। পুরস্কারের ভরসা সত্ত্বেও তাহার এতটা অনিচ্ছার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, গিরিধারীলাল রৌদ্রকে বড় ভয় করে, তাহার মস্তকে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত বংশছত্রটীই তাহার প্রমাণ ; কিন্তু রৌদ্রে বেড়াইলে আমার অসুখ বাড়িবার আশঙ্কায় পুরস্কারের প্রলোভন ত্যাগ করাটা কিছু অতিরিক্ত স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে হয়। যাহা হোক, আমার আগ্রহে গিরিধারী অবশেষে সম্মত হইলেও, তাহাকে বড় অপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার অহঙ্কার ছিল যে, আমি খুব রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিতে পারি ; কিন্তু ডুল্‌হা মাঝির বাড়ী পৌছাইতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গেলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ পথের কি আর শেষ নাই ? কত ধানের ক্ষেতের আল, কত চোরকাঁটার জঙ্গল, কত উঁচুনীচু মাঠ যে পার হইয়া আসিয়াছি, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। বোধ হয়, তিন চার ক্রোশ রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছি, এখনও গ্রামের দেখা নাই! যত জিজ্ঞাসা করি, "আর কতদূর আছে ?" সেই একই উত্তর শুনি —"বাবু সাহেব, নগিজ।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক চলিয়া ডুল্‌হা মাঝির 'ডেরা'য় পৌছিলাম। 'ডেরা' তো 'ডেরা'ই, একখানা মাঝারি খড়ের ঘর আর তারই সাম্‌নে একটু চাল দেওয়া দাওয়ার মত। ঘরের চারিপাশে জঙ্গলের মত বেড়া, সেই বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া গিরিধারী ডাকিতে লাগিল, "আগে মাঝিয়ান, মাঝিয়ান হো!" কিন্তু মাঝিয়ানের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

চিত্রপট।

ঘরের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট গোঁয়ানীর মত শব্দ আসিতেছিল, শুনিয়া আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা সঙ্গত মনে করিলাম না; কাঁটার বেড়া টপ্‌কাইয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলাম দেখিয়া, গিরিধারী ভয় পাইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঘরের ভিতর গোঁয়ানীর শব্দ শুনিয়া বুঝি কুর্ম্মীপুত্রের দিনের বেলাতেই ভূতের ভয় হইয়াছে; কিন্তু পরে বুঝিলাম, ঠিক্ তাহা নয়। গিরিধারীলাল এতক্ষণের পর তাহার ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া ফেলিল, বলিল, "বাবু সাহেব, ভিতর মৎ যাইয়ে, ডুল্‌হা মাঝি বড়ি দাঙ্গাবাজ আদ্‌মী, কোই জানে কোন্ ফাসাদ্ করেগা।"

আমার শরীরটা পরিশ্রমে অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছিল, তবু গিরিধারীর কথা শুনিয়া হাসি আসিল, এতক্ষণে বুঝিলাম, "মাঝিয়ান থাপ্‌সুরৎ" শুনিয়াই আমি এতটা পথ পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি, গিরিধারীলাল অনুমান দ্বারা এই রকম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে।

যাক্, সে যা ভাবে ভাবুক না কেন, আমার তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি বেড়া টপ্‌কিয়া গিয়া ঘরের আগড় খুলিয়া ফেলিলাম, গিরীধারীও আমার পিছনে আসিল।

রৌদ্র থেকে ভিতরে এসে প্রথমটা সব যেন অন্ধকার ধোঁয়ার মত বোধ হইতেছিল। তারপর দেখিলাম, ঘরের দুয়ারের পাশেই একটী কঙ্কালসার শিশুমূর্ত্তি, আমাদের দেখে সে হামা দিয়ে আমা-

দের কাছে আসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু উঠিবার উপক্রম করিবা-মাত্র পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার কণ্ঠনালী হইতে একটী অস্ফুট শব্দমাত্র বাহির হইল। তার একটু তফাতে আর একটী চার পাঁচ বৎসরের ছেলে মাটীতে পড়ে ঘুমাইতেছে, সে এতই শীর্ণ হয়ে গিয়াছে যে, তাকে দেখ্‌লে প্রথমটা নিদ্রিত কি মৃত তাহা বুঝা যায় না।

ছেলে দুটীকে দেখিবার পর তাহাদের মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সে তখন অতি কষ্টে উঠিয়া ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল দিয়ে কোন রকমে আপনাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাদের কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, "বাবুয়া হামারা অন্ বিন্ মর্ গেঁই, তিন রোজসে ঐসিন পড়ল্ রহা," অর্থাৎ আমার বাছারা অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছে, তিন দিন থেকে এইভাবে পড়িয়া আছে। আহা বাছারে! তোর বাছারা মরিয়াছে বলিতেছিস্, তোরই বা মরিবার বাকি কি আছে ?

যাহাদের অন্নাভাবে কষ্ট পেতে হয়নি, তারা যদি আমার ডায়েরী পড়ে তা হলে হয়তো ভাব্‌বে, আমি কিছু অতিরঞ্জন-প্রিয় ; কিন্তু সত্য বল্‌তে গেলে, আমি যে দুরবস্থা চোখে দেখ্‌লাম, তা বর্ণনা করিবার মত ভাষা খুঁজে পাই না। আশ্চর্য্য কাণ্ড! গাঁয়ে কি লোক নাই ? গিরিধারী বলিল, "সকলেরই প্রায় এক অবস্থা, কে কাহার খোঁজ নিবে ?"

বেশ কথা! তবে সকলেরই দেখ্‌ছি ঘরে সিঁধ দেওয়ার মত অবস্থা। আমার বন্ধুর কার্য্যের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই সহযোগী আবশ্যক হইবে বোধ হয়। আমি এখন বেশ বুঝিলাম, দুল্‌হা

জেলে যাইবার সময় তাহার ঘরে যে স্ত্রী পুত্র অনাহারে মরিবে একথা বুঝিয়াই জেলে গিয়াছিল।

যাহা হউক, আমার তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিবার সময় ছিল না। গিরিধারীর হাঁকডাকে জনকতক লোক জড় হইল। তাহাদের ভিতর দু'তিন জনকে দুধের সন্ধানে আর দু'তিন জনকে ডুলির সন্ধানে পাঠাইলাম। গিরিধারী সত্যই বলিয়াছিল, সকলেরই প্রায় একরকম অবস্থা।

বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রি বলিয়া অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টীকে হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার বন্ধু আমার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে চুরুট মুখে ঘন ঘন রাস্তায় পায়চারী করিতেছিলেন, আমার অগ্রগামী লণ্ঠনের আলো দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন, আর আমার কাছে আসিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অত বড় একটা রোম্যান্সের ব্যাপার প্র—র মত লোকের আর কখন ঘটে ছিল কিনা জানি না।

বাড়ী ফিরে আর আমার বস্‌বার ক্ষমতা ছিল না; শরীরটা যে এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আগে তা বুঝ্‌তে পারিনি। আমি শয্যার আশ্রয়-গ্রহণ করিলাম, বন্ধু থার্ম্মমিটার লইয়া আসিলেন, তখন জ্বর ১০৪ এর কিছু উপরে। প্র—তো একেবারে অস্থির। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য যদিও তাঁর কৌতূহল বড় কম হয় নাই, তবু কৌতূহল দমন করিয়া তিনি আমাকে ঘুমাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার একেবারেই ঘুম আসিতেছিল না। ঘটনাগুলি সংক্ষেপে তাঁহাকে শুনাইয়া

দিলাম। কথা বলিবার সময় আমার গলা কাঁপিতেছিল, প্রবল জ্বরের জন্যও বটে—অশ্রুজলের আবেগেও বটে। এই যে এখন লিখিতেছি, এখনও আমার চোখের জল পড়িয়া কালীর অক্ষর মুছিয়া যাইতেছে। করুণাময়কে প্রণাম করি—বার বার তাঁহাকে প্রণাম করি। আমার মনে এমন শুভ ইচ্ছা, যে ইচ্ছাময় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আর একদিন বিলম্ব করিলে হয়তো শিশু দু'টী মরিয়া যাইত। দেখিলাম, আমার বিচারপতি বন্ধুও ঘন ঘন রুমালে চোখের জল মুছিতেছেন!

১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার। আজ সকালে উঠিয়া শরীরটা অনেক ভাল বোধ হইল, বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কাল ডায়েরী লেখা হয় নাই, আজ মুখ ধুইয়াই আগে গতদিনের ঘটনাগুলি লিখিলাম। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলেদু'টীর অবস্থা কিছু ভাল। ডাক্তার বাবু আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, পেটের অসুখ না হইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

২৭শে কার্ত্তিক, সোমবার। পাঁচ ছয় দিন জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, সরযু এ কয়দিন অনেক সময়ই আমার কাছে থাকিত, প্র— সস্ত্রীক আমার রাত্রের শুশ্রূষার ভার নিয়াছিলেন। আজ সকালে আমি অনেকটা ভাল আছি। এইমাত্র বাড়ী হইতে বাবার পত্র পাইলাম, মিনির বিবাহ একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের ২৪শে বিবাহ। আমাকে বোধ হয় ৫।৬ দিনের ভিতরই কলিকাতায় যাইতে হইবে। যাহোক্ বাঁচা গেল, মিনির বিয়ের জন্য দুই বৎসর নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে, যে রকম ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গেল, তাতে আর সেজন্য কোন দুঃখ

নাই। সরযূ আজ আবার আমার কাছে একটু লজ্জা করিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু আমি একটা ছবির বইয়ের ছবি দেখাইয়া সে চেষ্টাটুকু সফল হইতে দিই নাই। মেয়েটী স্বভাবতঃই ভারী শান্ত। আমি মিনির বিবাহের উপলক্ষে, প্র—কে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু ঘানীর বলদের তো আর ঘানী ছাড়িয়া নড়িবার উপায় নাই। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টী অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় এবার তাহারা বাঁচিয়া গেল। যাইবার সময় খরচের টাকা বাদে আর যাহা কিছু থাকিবে, তাহাদের জন্য রাখিয়া যাইব ভাবিয়াছি।

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার। কাল মিনির বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বরকন্যা বিদায় দিয়া বাড়ীটা যেন একেবারেই খালি হইয়া গিয়াছে, যাওয়ার সময় মিনির যে কান্না! মিনির কান্নায় মিনি-বেড়ালটী পর্য্যন্ত কেঁদেছিল। বাবা এত গম্ভীরস্বভাব, বাবাই চোখের জল রাখিতে পারেন নাই। মিনিকে যেমন বলিতাম, রাঙ্গা বর এনে দেব, তেমনি সুন্দর বর হয়েছে। এমন সরল মিষ্টি স্বভাব, ঠিক আমার মিনিরই মতন। এমন ছেলেমানুষের মত কথাবার্ত্তা যে, এই ছেলে আবার অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানের সঙ্গে বি, এ, পাশ হয়েছে তা যেন মনেই হয় না। মিনির বৌদিদি মিনির বিবাহে যে উপহার পদ্যটা লিখেছিলেন, সেটা আমার বেশ ভাল লাগিল। আমি দেখ্ছি, গৃহিণী ক্রমেই কবি হয়ে উঠ্ছেন, আমার মত মূর্খের সঙ্গে তাঁর মিল থাকা অসম্ভব হয়ে উঠ্বে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

আজ দুল্হা মাঝি আমাদের বাড়ীতে এসেছে। হাওড়া থেকে পথ চিন্তে পারেনি বলে, তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছিল। সে

এসেই যখন আমাকে দেখ্‌তে পেলে, "বাবু সাহেব!" বলে আমার পায়ের তলায় একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। বেচারী আর একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লে না। আমি ওকে দেখে ভারী খুসী হয়েছি। দরোয়ান বাড়ী যাবে বল্‌ছে, সে যত দিন না আসে, ততদিন তার কাজ ডুল্‌হাই কর্ত্তে পারবে। তার পর যা হয় দেখা যাবে।

নিশি

রামকান্ত বাবুকে বড়ই নির্লিপ্তস্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ-সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথা-সময়ে পোষাকটী পরিয়া ছাতিটী মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসা, এই দুইটী কেবল তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য। লোকের সহিত আলাপপরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজন বশতঃ মাঝে মাঝে কাহা-রও সহিত দুই চারিটী কথা বলিতেন, এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন, "রামকান্ত পাখীর মন, বাঁধা আছে অনুক্ষণ, গৃহপিঞ্জরে" কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহার গুড়গুড়িটী ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সঙ্গী ছিল না।

রামকান্তের সংসারটী ক্ষুদ্র। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে ক্বচিৎ হইত, এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়িটী, তাকিয়া ও দুই একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী ঘরকন্নার কাজ কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। বাড়ীতে অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালকবালিকার কোলাহল নাই, এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সহসা আনন্দহীন শান্তিভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দকোলাহল উঠিল। যেন দেবতাপূজার একটী নির্ম্মাল্য দেবপদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীর শূন্য অঙ্কে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশিনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতি-বিধি ছিল না; কিন্তু আজ সে নিয়ম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এতাদনের পর রামকান্তের একটী মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহ-সমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্ব্বি-কারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুরোধে একবার সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া কন্যাটীকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কি না, অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটী যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। এ কি শক্তি! মাতৃ অঙ্কশায়িনী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটীর এত ক্ষমতা!

পূর্ব্বে রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ করিয়া যেমন নিশ্চিন্তমনে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন, এখন ঠিক আর সেরূপ হয় না। কন্যাপ্রসবের পর হইতেই রাজলক্ষ্মী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের শান্তিসুখ একেবারেই গিয়াছে। গৃহে আর লোক নাই, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটীরও যত্ন হয় না। রামকান্তের এই

বিপদের সময় তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও রামকান্তের গৃহে আসেন নাই, তাঁহারাই এখন তাঁহার গৃহস্থালীর ও কন্যা-পালনের ভার লইলেন। রামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

রাজলক্ষ্মীর বিছানা :হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, মেয়েটী তাঁহার কোলের কাছে শুইয়া হাত পা নাড়িয়া খেলা করিত, রাজলক্ষ্মীর তখন একবার উঠিয়া তাহাকে কোলে করিবার জন্য প্রাণের ভিতর হাকুলী বিকুলী হইত, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই, শুইয়া শুইয়াই মেয়ের গায়ে একবার হাত দিতেন। কখনও, নিকটে কেহ না থাকিলে, মেয়ে যখন ক্ষুধায় কাঁদিত, রাজলক্ষ্মীরও চোখ দিয়া জল পড়িত, কাতর ভাবে বলিতেন, "ঠাকুর, কবে আমি ভাল হবো"! রাজলক্ষ্মীর সযত্নমার্জ্জিত ঘর দুয়ার মলিন হইয়া গিয়াছে, বাক্সের উপর, দেরাজের গায়ে ধূলা জমিয়াছে, জিনিষ পত্র যে কোন্‌টা কোনখানে গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই; রাজলক্ষ্মী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন, আর নিশ্বাস ফেলিতেন। কখনও বা মৃদুস্বরে কোন প্রতিবেশিনীকে বলিতেন, "দিদি, ফরসীটা ক্ষ্যান্তর কাছে মাজ্‌তে দি'ও, ময়লা ফরসীতে উনি তামাক টানিতে পারেন না।" এই কথাটী বলিতেই যেন কত সঙ্কোচ! "দিদি, মাছের ঝোল হলে উনি দুটী ভাত খেতে পারেন!" কত অনুনয়ের স্বরেই বলিতেন।

রামকান্ত কখন কখনও আসিয়া রাজলক্ষ্মীর মাথার কাছে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতেন। "দেখ, খুকি কেমন খেলা করছে,

ওর চোখ দুটী কার মত হয়েছে বল দেখি?” এইরূপ নানা কথা বলিয়া মা যেমন রোরুদ্যমান সন্তানকে ভুলায় তেমনি রাজলক্ষ্মী স্বামীর বিষণ্ণতা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। রামকান্তের মুখে একটু হাসি দেখিলেই পীড়িতার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

তিনমাস এইভাবে কাটিয়া গেল। পূর্ণ তিন মাস শয্যাগত অবস্থায় রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মী সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। চিরবিদায়ের সময়—এখনই যে রাজলক্ষ্মী চলিয়া যাইবেন, রামকান্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রতিদিনের মত তাঁহার মাথার কাছে বসিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী যখন বলিলেন, “তুমি একটু সরে এস, আমি যে তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।” তখন পত্নীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রামকান্তের মনে সহসা কি যেন আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ব্যাপার যে কি ঘটিতেছে, ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতেই আত্মীয়স্বজনগণ তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, রামকান্ত শূন্যগৃহে একাকী নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

২

পত্নীর অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটীকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; পত্নীবিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত। পত্নী জীবিতা থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভালবাসিতেন কি না তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার

স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। একদিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটী ভালবাসার কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদাপ্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা, সেই অন্তিম বাক্য বার বার মনে পড়িতে লাগিল। রামকান্তের মনে হইল, রাজলক্ষ্মী যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ছি! চোখ মুছে ফেল, খুকীকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন, "এমন করে আর কতদিন থাকিবে? মেয়েটাকে তো বাঁচাতে হবে। আবার বিবাহ কর।"

প্রবীণগণ বলিলেন, "এত অল্পবয়সে কি গৃহশূন্য শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি, কি সুন্দর মুখশ্রী! একি বাঁচিবে? ভগবান্ কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটী দান করিবেন?

মেয়েটী বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়াই বুঝি বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিলেন, "নিশি"।

৩

রামকান্তের আয় অল্প, সংসারটীও ক্ষুদ্র। একটী পিতা একটী কন্যা, কিম্বা একটী মা আর একটী ছেলে। বেশীর ভাগ একটী ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু এখনই সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সেই এ সংসারের গৃহিণী।

ঘরের জিনিষপত্র সে ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস থেকে আসিবার আগে জলের ঘটিটী, গামছাখানি, কাপড়খানি এ সকল সে কখনও ঝিকে রাখিতে দেয় না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কঠিন শাসন। যদি কোন দিন তিনি ভুলিয়া ছাতিটী বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিশি "এত রোদ লাগিয়েছো, দেখো, অসুখ কর্‌বে, তা হ'লে আর আফিস যেতে পাবে না" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শাসন করে; কেবল তাহাই নহে, তাহার পর অন্ততঃ দশদিন রামকান্তের ,অভিভাবিকা আফিসে যাইবার সময় তাঁহার ছাতাটী আনিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। রামকান্ত সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিল মাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া "গল্প বল, ও বাবা, একটা গল্প বল" বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন, গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোন দিন যদি আফিস থেকে এসে "আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি" বলিয়া শয়ন করেন, সেদিন নিশির খেলা-ধূলা একেবারে বন্ধ হয়। "বাবা তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? তোমার পা টিপে দেব? একটু জল খাবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। মনের ভাব্‌টা যে, হয়ত বাবা বলিতেছেন না, বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দুটী ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া আফিস যাইতেন; নিশিও যত বড় হইতে লাগিল,

ক্রমে তাহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা, তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। তুমি দেখইনা কেন! তুমি তাড়াতাড়ি পার না, আমি বেশ ভাল করে রাঁধব।" ইত্যাদি নানাপ্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোন দিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সে দিন রান্নার ধুম দেখে কে? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকী থাকিত না, তাহার পরদিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, "তবে আজ আমরা দু'জনেই রাঁধিব।"

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়ীটীর জানালার দিকে চাহিয়া দেখ, একটী ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপাগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, দু'খানি ছোট ছোট হাতে তাহা সরাইয়া দিতেছে। যাই ছাতি হাত রামকান্ত গলীর মোড়ে দর্শন দিতেন, অমনি চারিটী চোখে চোখোচোখি হইত।

৪

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে। দশ বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই,—সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে, তাহাতে এখনকার দিনে অসৎপাত্রই জুটিয়া উঠে না। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করেন, "আহা মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে। হাজার হো'ক, এখন বড়টী হ'য়েছে, বিয়েতে কি আর সাধ হয় না? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি

মলিন করে থাকে।” আহা, :সত্যই আজকাল নিশির মুখখানি বড়ই ম্লান। রাঙা রাঙা ঠোঁট দু’খানি সর্ব্বদা হাসিমাখা থাকিত, আজকাল কেন জানি না, সে ওষ্ঠে আর হাসি নাই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক যে, একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল নিয়া গেলে আর “আমার মা লক্ষ্মী” বলিয়া আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের এত অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে, তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না!

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতামাতার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ-সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্ল্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানালায় আসিতেছে, কত ঠাকুর দেবতাকে মানিতেছে, তবু রাম-কান্তের দেখা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে, ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়,—কই কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “বাবা, এত দেরী কেন?” রামকান্ত কেবল বলিলেন, “একটু কাজে” আর কিছু বলিলেন না।

বিমর্ষভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটী ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

৫

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয়মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া, কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এতদিনে একটী ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎস্বভাব, বাপ মা কেহই নাই, আসামের পোষ্টাফিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয় মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুরবাড়ীর সকলে ভালবাসিবে কিনা, এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাবী জামাতার মধুর চরিত্র ও ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন, ততই হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নিশি

জানালার ধারে বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে একবিন্দু জল আসিল,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, যেন অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রু-বিন্দুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাবা, কাল কি রাঁধব, বল না?" পিতা বলিলেন, "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন তো খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলে, এখন ছেলেটীকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে?" নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা, আমি কোথা যাব?" রামকান্ত বলিলেন, "চিরকালই কি মা, তুমি আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে থাকবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হ'য়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন ক'রে তোকে পরের হাতে দিব। দেবতা করুন, চিরজীবন সুখী হ'য়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না! নিশি অর্দ্ধস্বরে বলিল,

"বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" আর কোন কথা হইল না।

৭

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল, অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটী পাছে আবার হাতছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিস পত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময়ের অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটী ফুরাইয়া গেল, তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন, "সম্মুখে অকাল, আর আমারও শীঘ্র ছুটী পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্ব্বদা লিখিবেন।" রামকান্ত বাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধরপল্লব দু'খানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার-নিদ্রা নাই, দিবারাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কথনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে,

"বাবা, আমার অসুখ ভাল হলে কি কি খাব, সেই গল্প করি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই,—"ও বাবা, শোও না।" রামকান্ত বলেন, "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ করে ঘুমাও।" নিশি বলে, "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমালে আমি ঘুমাব না।"

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া নিশির বিছানায় নিশির শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ডাক্তার মুহুর্মুহুঃ নাড়ী দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার বাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন, "নিশি, মা আমার!" নিশি জাগিয়া উঠিল। "বাবা" বলিয়া হাত দু'খানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়া দিল, আর সেই মুহূর্ত্তেই রামকান্তের গৃহের আলো জন্মের মত নিবিয়া গেল।

ইহার চারিদিন পরে একদিন রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন, অমনি জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানালার উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মা আমার, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে

সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কিনা, এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যার ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না বন্ধনের মুক্তি ভাল, এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।” নিশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।

কন্যাদায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খুব ভোরেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। "বাড়ী" বলিতে অনেক দিনের পর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আর সে বাড়ী চোখে দেখি নাই, এখন মামার বাড়ীই আমাদের আশ্রয়, এই আশ্রয় না থাকিলে মা ও আমরা তিনটী ভাইবোন যে কোথায় দাঁড়াইতাম, ভাবিয়া পাই না।

যখন প্রথম মামার বাড়ীতে আসি, চারু তখন পাঁচ বছরের তরু সাত বছরের। তরুর নিজের অবস্থা বুঝিবার মত জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু চারু তো কিছুতেই বুঝেনা, কেবলি বলিত, "মা, এ বাড়ীতে থাক্‌বো না, এ বাড়ী ভাল নয়, আমাদের সে বাড়ী কই?" মা চারুর কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইতেন। আমি বুঝিতে পারিতাম, চোখের জল লুকাইবার জন্য মা মুখ ফিরাইয়াছেন, কিন্তু চারু তো তাহা বুঝিত না, কেবলই মা'র আঁচল ধরিয়া টানিত, আর সেই এক কথা "ওমা, বাড়ী চল।"

সে দিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার শীত শীত করিতেছিল, মনে হইতেছিল, "বুঝি জ্বর আসে।" মাতুলালয়ের পল্লীটী কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া ধরা হইলেও এখানে সহরের কোন চিহ্ন ছিল না। এজন্য চারিপাশের ঝোপ্ ঝাপে ম্যালেরিয়ার বাসা ছিল, কাজেই আজ পাঁচ ছয় মাস হইতে আমার

উপরও তাঁহার শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। বাড়ীখানি একতলা, দুটী ঘর ও একটী রোয়াক মাত্র, তাহাও আবার অনেক দিন হইতে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, বালি চুণ সমস্তই খসিয়া গিয়াছে, কেবল জীর্ণ ইষ্টকের কঙ্কাল কয়খানি কোন মতে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। আম, জাম ও নারিকেল গাছ চারিদিক হইতে বাড়ী খানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার লজ্জানিবারণ করিয়াছে। পিছনে এঁদো পুকুর, সেইটীই ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রিয়স্থান।

বড় মামা সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, পঁচিশটী টাকা মাহিনা পান, আর দুটী মামা এখনও পঠদ্দশায়। ইহা হইতেই সাংসারিক অবস্থা অনুমেয়।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়াই মা বাহিরে আসিলেন। বোধ হয় আমার জন্য মার সমস্ত রাত্রিই ঘুম হয় নাই। বাহিরে আসিয়া, বলিলেন, "অমূল্য, এলি বাবা? অসুখ শরীর নিয়ে অতদূর যাওয়া আমার মন ভারী উতলা হয়েছিল। কোন অসুখ করেনি তো?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা, 'মানকর' ষ্টেসন যদি তোমার কাছে 'অতদূর' হয়, তবে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন তো পৃথিবীর বাহিরে। তোমার আর কোন কালে তীর্থ করা হবে না।"

মা বলিলেন, "কে জানে বাছা কতদূর; জন্মে কখনও রেল গাড়ীতে উঠিনি, পাড়া গাঁ শুন্‌লেই মনে হয়, সে কোন তেপান্তর মাঠের ভিতর। তা যাক্‌গে, তুই আছিস্ কেমন, বেশী ঠাণ্ডা লাগাস্ নি তো?"

আমি। মা, যার জন্য গিয়াছিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে না

কেবল বাজে বকৃছো। তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করলে না, তেমনি আমিও তোমাকে কিছু বল্‌ছি না।

"আচ্ছা বলিস্‌নে।" বলিয়া মা গৃহকার্য্যে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ভাবিলাম, আমিই তবে হারিলাম।

এমন সময় বড় মামা বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কিরে অমূল্য, ছেলে কেমন দেখে এলি, বাড়ী ঘর কেমন দেখ্‌লি ? কত চায় তারা ?"

আমি। ছেলেটী মন্দ নয়। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়েছিল, এখন পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় ঢুকেছে। বাড়ী ঘর বেশ ভাল, বাড়ীতে বাগান পুকুরও আছে। ধেনো জমিও কিছু আছে, তাতে বেশ ধান হয়।

মামা। এ সব তো ভালই, এখন আসল কথা, চায় কত ?

আমি। মাসীমার বাড়ী তরু যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন ছেলে নাকি নিজেই তরুকে দেখেছে। ধরণীবাবু বল্‌লেন, "আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমেও ছাড়তুম না, তবে ছেলের পছন্দ হয়েছে, আর তোমাদের অবস্থাও ভাল নয় শুনেছি, এই জন্য পাঁচশো টাকাতেই রাজী হতে হোলো।"

মামা। পাঁচশো টাকা! এবার তোর মাথার চুল বিকিয়ে যাবে। এ টাকা ছাড়া আরও কিছু দিতে থুতে হবে নাকি ?

আমি। না, ঐ টাকার ভিতরই সব, এই কথা তো বলেছেন।

মামা। "এক রকম সস্তাই বল্‌তে হবে, কিন্তু পাঁচশো টাকা কি করে যোগাড় হবে।" তাইতো! বলিতে বলিতে মামা স্নান করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

মা তখন স্নান করিয়া আসিয়াছেন, তরু বঁটি লইয়া কুটনো কুটিতেছে। আমি মা'র নিকটে গিয়া বলিলাম, "মা, তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এসেছি, এখন পাঁচশো টাকা দাও।"

মা ম্লান হাসি হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "পাঁচশো টাকা চাওয়া ভুল হয়েছে মা, ছ'শোই দিতে হবে, বরযাত্রী খাওয়ানো আছে, আর আমরাই বা কি দোষ করেছি যে, খেতে পাবনা।"

মা বলিলেন, "আমার যথাসর্ব্বস্ব ধন কেবল তুমি আছ, আর কিছু নাই।"

"তবে আমাকেই বিক্রী কর, করে টাকা দাও। টাকা না দিলে তো মেয়ের বিয়ে হবে না।"

তরুর দিকে চাহিয়া দেখি, ঘাড় হেঁট করিতে করিতে সে বঁটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। বাস্তবিক তরুর জন্য ভারি কষ্ট হয়। উঠিতে বসিতে, কথায় কথায়, মার কাছে বকুনী খায়। অপরাধ কি—না বিয়ে হয় না। আমি ভাবি, ও বেচারী কি করিবে? বিয়ে করিতে যে ওর অনিচ্ছা এমন কথাতো কখন বলে নাই, যদিই বা বলে তাহাতেও কিছু বিবাহ বন্ধ হইবে না। বিবাহ বন্ধ হইতেছে কেবল টাকার জন্য, তাতে ওর দোষ কি? বাস্তবিক মার কি অন্যায়! তরু খাবার চাহিলে মা রাগের মাথায় কতদিন বলিতেন, "থুবড়ি! বিয়ে হয় না, কেবল খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্ছে।" একি আশ্চর্য্য! বিয়ে হয় না বলিয়া সে উপাস করিয়া থাকিবে নাকি? আবার না খাইলেও বকুনি, "বিয়ের চিন্তায় বুঝি মুখে অন্ন রুচেনা?" পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে যাওয়া

বন্ধ, "এত বড় আইবুড় মেয়ের কি পাড়ায় বেড়ানো ভাল দেখায়?" বেচারীর কি কষ্ট! আমি মনে করিতাম, "মেয়েগুলো কেন যে জন্মায়!" কিন্তু, আজ তরু তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া অসাবধানে একঘটী জল ফেলিয়া দিল, মা তবুও কিছু বলিলেন না, এটা একটা আশ্চর্য্যের কথা। বোধ হয় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে দেখিয়া মা তরুর উপর খুসী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেদিন ভাত খাইতে বসিয়া আমি কেবল টাকার কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবনাটা আমার তেমন অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আজকাল তাহার সঙ্গে একটু একটু করিয়া আলাপ হইতেছে। দিদির বিবাহের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হয় নাই, তখন আমি ছোট ছিলাম বলিয়া মা একাই সকল ভাবনার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু তরুর যে আবার বিবাহ দিতে হইবে সে কথা বোধ হয় মার মনে ছিল না, তাই যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত ঘুচাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া "ভাল ঘরে" দিদির বিবাহ দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি দিদির শ্বশুররা খুব বড় মানুষ, তাঁহাদের অর্থের অভাব কিছুই নাই, তবে কেন দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকু গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল, একথা বুঝিতে পারি না। ধনী কুটুম্ব করিবার সাধ মার বড়ই প্রবল ছিল, তাহারই ফলে বিবাহের পর দিদি যে এক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সে এক বৎসর মা আর তাহাকে দেখিতে পান নাই, কেবল তাঁহার যাত্রা করিবার দিন লোকের মুখে সংবাদ পাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া একবার শেষ

দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, সে কথা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। লক্ষ্মী প্রতিমার মত দিদির সেই সুন্দর অচেতন দেহখানি অঙ্গনে পড়িয়া আছে, সেই সুন্দর কালো চুলগুলি ভূমিতে লুটাইতেছে,—উঃ, সে কি চোখে দেখা যায়! দিদির শাশুড়ী দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ওরে হাতের চুড়িগুলো আর তাগা দুগাছা খুলেনে।" সে কথা যেন বজ্রধ্বনির মত আমার কানে গিয়া লাগিয়াছিল। দিদির মুখের কাছে মুখ নিয়া ডাকিলাম, "দিদি!" সেই আমার মৃদুস্বরের ডাকেই দিদির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, চোখ খুলিয়া যখন আমার দিকে চাহিলেন, সে চোখে কি করুণ স্নেহের দৃষ্টিই দেখিয়াছিলাম!

কি কথা ভাবিতে ভাবিতে যে কি কথা মনে আসিয়া পড়ে তাহার ঠিক নাই। দিদির কথা মনে পড়িয়া আমিতো তরুর বিবাহের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া মনে করিতেছেন, সেই চিন্তাতেই বুঝি আমি তন্ময় হইয়া আছি। বোধ হয় অনেক ক্ষণ মা আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুই যে কিছুই খেতে পার্‌লিনে? অমূল্য, অত ভাবিস্‌নে বাবা, ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। বন্ধকী বাড়ীটা বিক্রী হলে কি চারশো টাকাও পাওয়া যাবে না? আমার যেমন অদৃষ্ট! দুধের ছেলে তুই, পোনের বছর বয়সেই তোকে বোনের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হোল।"

মার কথা শুনিয়া আমার ভারী লজ্জা হইল। মাকে থামাই-

বার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না মা, আমি কিছুই ভাবছিনে। তুমি আজ একবার মাসীমার কাছে গিয়ে বলে দেখো তিনি যদি কিছু ধার দেন।"

"আমোদিনী! সে আবার টাকা দেবে? সে যার "দিদি" বলে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেই লজ্জা পায়, তরুর বিয়েতে সে টাকা দেবে! তবু মনীনকে ভাল বল্‌তে হয়, সে ভগ্নীপতি, বোনই যখন বোনের দুঃখ বোঝে না, তখন ভগ্নীপতিকে আর কি বোলবো? টাকার কথা যা হোক, আমোদিনী যদি তার বাড়ী থেকে বিয়ে দিতে দেয় তা হলেও বাঁচি। এ বাড়ী তো একে ভাঙ্গা তায় মোটে দুখানা ঘর। সভাই বা কোথায় হবে, লোক জনই বা কোথায় বস্‌বে?"

আমি মায়ের কথায় আর কিছু উত্তর দিলাম না। কেননা, জানিতাম, কথায় কথা বাড়িলে ক্রমে পুরাণো কথা উঠিয়া পড়িবে আর সেই সঙ্গে মায়ের দুঃখসমুদ্রও উথলিয়া উঠিবে, শেষে মা কাঁদিতে আরম্ভ করিবেন। ভাত খাওয়া শেষ করিয়াই মাসীমার বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। পথে এক পসলা বৃষ্টি আসিল, ছাতা ছিল না, বাধ্য হইয়া ভিজিতে হইল।

অদৃষ্টগুণে ও সৌন্দর্য্যের গুণে মাসীমা ধনবানের পত্নী হইয়াছিলেন। মাসীমা যে মাকে "দিদি" বলিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহাতে মাসীমাকে দোষ দেওয়া যায় না। আজ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের অপেক্ষা মাসীমার দেউড়ির দরোয়ানের পোষাক তো ভালই, এমন কি হরে চাকরের কাপড় জামাও অনেক ভাল।

তবু সেই ময়লা ভিজা কাপড়ে সেই কাদা মাখা জুতা পায়েই দ্বিতলে উঠিলাম। মাসীমা তখন আহারান্তে শয়নগৃহে সোফার উপর শুইয়া একখানি উপন্যাস পড়িতেছিলেন, মেসোমহাশয় দুয়ারের নিকট চেয়ারে বসিয়া ধুম পান করিতে করিতে সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কিরে অমূল্য, বর দেখে এলি ?"

আমি বর দেখার বিস্তারিত বিবরণ মেসোমহাশয়ের নিকট বলিলাম। মেসোমহাশয় বিষয়ী লোক, খুঁটীনাটী সকল দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সমস্ত বিবরণ আমার নিকট সংগ্রহ করিয়া অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "সম্বন্ধটা তবে মন্দ নয়।" আমি বলিলাম, "পাড়া গাঁ বলে মার একটু মন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ছে ?"

আমার কথা শুনিয়া সোফা হইতে মাথা তুলিয়া মাসীমা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মেসোমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "দিদির ওসব কথা যেতে দাও। এখন কাজের কথা হোক্। টাকার কথা একেবারে ঠিক্‌ঠাক হয়ে গিয়েছে ?"

"হাঁ পাঁচশোর ভিতরই সব, এই রকম কথা হয়েছে।" "কথা তো হয়েছে, কিন্তু হয় তো এরপর আবার নূতন কিছু বায়না নিয়ে বস্‌বে। তা সে যা হয় হবে, এখন টাকার চেষ্টাটা আগে চাই। তোদের বাড়ীটা রেখে আর কি হবে, সুদে সুদে আর কিছু দিন পরে বাড়ী থেকে একটা পয়সা পাওয়া যাবে না। বাড়ীটা বিক্রীর চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আপনি ভার না নিলে কোন মতেই

হবে না। আপনি এ সমস্ত যেমন বোঝেন—” মেসোমহাশয় হাসিতে লাগিলেন, বিষয়কার্য্য তিনি ভাল বুঝেন, এ কথা কেহ বলিলে তাঁহার বড়ই আমোদ হইত। বলিলেন, “দেখা যাক্ কি হয়, বিয়ে তো এই মাসেই ?”

তা নইলে তো আর দিন নাই! সম্মুখে ভাদ্র মাস, তার পরও আশ্বিন কার্ত্তিক দু’মাস বিয়ে হবে না। “তবে তো এই মাসে দেওয়া দরকার বটে।”

আমি বলিলাম, “বিয়ে কোন্ বাড়ী থেকে হবে ? ও বাড়ীতে মোটে দু’খানা ঘর, কোথায় সভা হবে, কোথায় বরযাত্রী বস্‌বে, মা এই কথা বল্‌ছিলেন !”

মেসোমহাশয় বলিলেন, “তাই তো! তা না হয় এ বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে।”

মাসীমা এই বার হাতের উপন্যাস রাখিয়া দিলেন। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া একবার মেসোমহাশয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন; শেষে একটু শ্লেষের স্বরে বলিলেন, “যাদের মোটে দু’খানা ঘর তারা কি আর মেয়ের বিয়ে দেয় না ? সকলেরই কি তোমার মত ভগ্নীপতি থাকে যে, তার বাড়ী থেকে বিয়ে দেবে ?”

মেসোমহাশয় হাসিতে লাগিলেন। আমি দুয়ারে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, একবার আমার দিকে একবার মাসীমার দিকে চাহিয়া মেসোমহাশয় বলিলেন, “তোমার যদি কোন অমত থাকে, তবে ঐ বাড়ী থেকে তোমার বোনঝির বিয়ে হোক, কি বল ? তোমার অমতেতো আমি কোন কাজ করি না। তবে বরযাত্রীদের

জন্য তত ভাবি না, তুমি গিয়ে বস্‌বে কোথায় সেই ভাবনা হ'চ্ছে।"

মাসীমা এই কথা শুনিবামাত্র বই ফেলিয়া সশব্দে সোফা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে রাগ করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "তোমার বাড়ী তুমি যা খুসী তাই কর্‌বে, আমি কেন তাতে কথা কইতে যাবো?"

মেসোমহাশয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিয়া আমার বড়ই শীত করিতেছিল। মেসোমহাশয় আমার দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "একি অমূল্য, তুই কাঁপ্‌ছিস্ যে, শীতে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিস্! এতক্ষণ ভিজা কাপড়ে আছিস্? শীগ্‌গির কাপড় ছাড়্।"

আমি অতি কষ্টে বলিলাম, "বাড়ী গিয়েই কাপড় ছাড়্‌বো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের ফলে এবার আমার জ্বরটা খুব বেশীই হইল, দুই দিন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম। এ দুই দিন বড় মামা আফিস কামাই করিয়া আমার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় বরফ চাপাইয়াছিলেন।

বড় মামার স্বভাবটী ঠিক বুঝা যায় না। জীবনে কখনও তাঁর মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বড় মামার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বড় মামার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল, এক স্থানে প্রায় ঠিক ঠাক্‌ই হইয়া গিয়াছিল।

তখন আমার দিদিমা জীবিত ছিলেন, বধূমুখ দেখিবার জন্য ছেলের মায়েরা যেমন ব্যাকুল, দিদিমা তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যাকুলই হইয়াছিলেন। দিদিমার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, মনের ব্যাকুলতায় তাঁহার দু'চোখে যাহা পড়িত, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাহাই কিনিবার চেষ্টা করিতেন। গায়ে হলুদের তত্ত্বে পাঠাইতে খুঁটী নাটী যাহা দরকার, দিদিমার সমস্ত গুছান হইয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা পিতৃহীন হইয়া মাতুলের গলগ্রহরূপে উপস্থিত হইলাম। বাবা জীবিত থাকিতে লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া মনে করিত, কত আশ্রয়হীন তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই যে তাঁহার ঋণদায়ে আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হইব, একথা তিনি হয়তো কখনও মনে করেন নাই। আমরা মামার বাড়ী আসিবার পরদিন বড় মামা দিদিমাকে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব না।" বড় মামার কথায় ও কাজে কখনও অমিল হয় না, দিদিমা একথা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, তথাপি অনুনয়, বিনয়, অশ্রুবর্ষণ, আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখানো প্রভৃতি কোন উপায় অবলম্বন করিতেই ত্রুটী করিলেন না। অবশেষে কয়েক মাস পরে ভগ্নহৃদয়ে পরলোকে প্রস্থান করিলেন; পুত্রবধূর মুখদর্শনের সাধ আর তাঁহার মিটিল না।

বড় মামার মুখে মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই, কিন্তু কটুকথা অনেক শুনিয়াছি। স্বভাবতঃ বড় মামা একটু রাগী স্বভাবের, রাগ হইলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না, অনেক দিন রাগের মাথায় মাকে বলিতেন, "তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও। আমি গরীব মানুষ, এত লোককে কোথা থেকে খেতে দেব?" মা

একটীও উত্তর করিতেন না। নিঃশব্দে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত, আমি সে চোখের জল কত দিন দেখিয়াছি। মায়ের চোখের জল যেন আমার হাড়ের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া তুলিত। চাকরীর জন্য কত জায়গাই ঘুরিয়াছি, অবশেষে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত একটা প্রেসের কাজ জুটিয়া গেল। পরীক্ষা দিবার লোভ কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না বলিয়া দিনের কাজ আর নেওয়া হইল না।

এখন সে কথা যাক্। দুই দিনের পর যে দিন আমার সহজ জ্ঞান হইল, সেই দিন বড় মামা আর আফিস কামাই করিতে ভরসা করিলেন না। তাড়াতাড়ি দুটী গরম ভাতে-ভাত নাকে মুখে গুজিয়া আফিসে ছুটিলেন। বড় মামা বাহির হইয়া যাইবার পরক্ষণেই ঘটকী আসিয়া উপস্থিত।

"কর্ত্তা দিন করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, পরশু গায় হলুদ, তার পর দিনে বে', তা ছাড়া আর ভাল দিন নেই।" মা তো আকাশ হইতে পড়িলেন।

"সে কি, বিয়ের যে এ মাসে ঢের দিন আছে, এই তো মাসের মোটে আটদিন।"

ঘটকী বলিল, "সে সব দিন তেমন ভাল নয়, তারা অদিনে ছেলের বে' দেবে না। তা তোমাদের তো শুভ কাজ শীগ্‌গির হয়ে গেলেই ভাল, আর কিই বা এমন ঘটা করবে যে দু'দিনে যোগাড় হবে না।" মা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাড়ীতে লোক তো কেউ নেই, মণীনের কাছে এখন কে যায়। ফণী (বড় মামা) আফিস থেকে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়ে, আবার

এই দু'দিন না খাওয়া, রাত জাগায় তার শরীর একেবারে কাঠী হয়ে গিয়েছে, তাকেই বা কি করে বলি ?"

"আমি মেসোমহাশয়ের কাছে যাচ্ছি" বলিয়া আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মা "করিস্ কি অমূল্য, ঘুরে পড়ে যাবি" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু সে কথা শুনিতে গেলে চলে না, কাজেই আর বাধ্য ছেলে হওয়া চলিল না।

মেসোমহাশয় বারাণ্ডার সম্মুখে দুয়ারের কাছে চেয়ারে বসিয়া খড়্খড়িতে পা দিয়া খবরের কাগজ পাঠে মগ্ন ছিলেন; আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "একি অমূল্য, তোর না ভারী অসুখ ?"

আমি এক নিশ্বাসে সমস্ত বক্তব্য শেষ করিয়া মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িলাম।

মেসোমহাশয় জমীদারী চালে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তাইতো, দু'দিনের ভিতর কি করে হয়, বাড়ী বিক্রী কি মুখের কথা, তা আবার বন্ধকী বাড়ী।" আমি বলিলাম, "আপনি মনে করলে সমস্তই হবে। আপনি ছাড়া আর উপায় নেই।"

বেশ জানিতাম, এই কথাটীই মেসোমহাশয়কে কাজে লাগাইবার প্রধান ঔষধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাসীমার বাড়ী থেকেই বিবাহ হওয়া স্থির হইল। মাসীমা কিন্তু সে দিন মাথা ধরায় বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বরযাত্রী সহ বর আসিলেন। মেসোমহাশয় যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। অবশেষে সম্প্রদান স্থলে উপস্থিত হইয়াই বিপদ বাধিল। "এ কি, এ পাতে চাল ডাল, ঢালা দানসামগ্রী, বাসন কই? ছেলের ঘড়ী ঘড়ীচেন দিবে না, তাই বলিয়া কি আংটীও দিবে না? আসন বসন ছত্র অঙ্গুরী এসকল না দিলে কি সম্প্রদান হয়? একি হিন্দুর বাড়ী নয় না কি?"—বরকর্ত্তা একেবারে চটিয়া আগুন হইলেন, "আমি এমন ছোট লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিব না" বলিয়া পাত্রের হাত ধরিলেন। পাত্র বেচারীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, বেচারীর বিবাহ না করিয়া অমনি অমনি ফিরিয়া যাইতে একেবারেই ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করে, পিতার ভয়ে একেবারে নীরব। বাড়ীতে হাঁক ডাক চীৎকার বরযাত্রীদের কলরব ইত্যাদিতে বিবাহ আসরটী বেজায় জম্‌কাইয়া উঠিল। বড়মামার খুব রাগ হইলে কাছা খুলিয়া যাইত, এবং কথা বলিতে পারিতেন না। কথা বলিতে পারিতেন না এইটী মঙ্গলের বিষয়, নহিলে সে রাত্রে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিত।

তরু এতক্ষণ আলিপনা দেওয়া ধান বিছান পিঁড়ির উপর চেলীর কাপড় পরিয়া বসিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছিল, ভয়ে এখন তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চারু দিদিমণির পিছনে চুপ করিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। মা একেবারে মাটীতে শুইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিলেন, "অমূল্য, একি হোলরে বাবা! এখন যে জাত যায়!"

গোলমালে মাসীমার মাথা ধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "একি বালাই ঘাড়ে করা। আমি এই জন্যই তখন বলেছিলাম, তা আমার কথা শুন্‌বে কেন? এখন পরের জঞ্জাল ঘাড়ে করে নিয়ে কি কর্‌বে তা কর।"

মেসোমহাশয় আলমারী খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তোমার মেয়ের বিয়েতে এর চেয়েও বেশী জঞ্জাল ভুগ্‌তে হবে।"

তারপর মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, হয়েছে কি, তোমার অমন প্যানপ্যানে স্বভাব কেন? এ আর গোলমাল কিসের? গোলমাল নইলে কি বিয়ে হয়? এমন কত বিয়ে দেখে এসেছি। আমি যখন ভার নিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মেসোমহাশয় আলমারী হইতে ঘড়া ঘটী বাটী থালা কার্পেট ইত্যাদি বাহির করিতেছেন দেখিয়া মাসীমা বলিলেন, "ও হচ্ছে কি, সুরোর দানের জিনিষ বার কচ্ছ কেন?"

"তরুর দানে দেবো বলে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিবাহ-সভায় দানের সামগ্রী সাজানো হইয়া গেল, ছাতা জুতা কার্পেট কিছুই বাদ পড়িল না। বরকর্ত্তা চাহিয়া দেখিলেন, জিনিষ অনেক। আর সব জিনিষের মত জিনিষ বটে, অতএব অবাধে সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে কন্যা বিদায়। বর ক'নে গাড়ীতে উঠিলে বরকর্ত্তা দানসামগ্রীর আর কোন খোঁজ পাইলেন না। বলিলেন, "দানের জিনিষগুলি এই সঙ্গেই দিয়া দিন, ফুলশয্যার সঙ্গে পাঠাতে ভারী হাঙ্গাম হবে।"

মেসোমহাশয়ের গোমস্তা রামলোচন বাবু বরকর্ত্তার পাশে

দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যেন বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সে কি মশায়, দানের জিনিষ আবার কি, সে সব কিছু তো দেওয়ার কথা ছিল না! আপনি বলেছিলেন যে, পাঁচশোর ভিতরই সব।"

"আরে তাতো বলেছি। কাল দানে যে জিনিষ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কোথা গেল।"

"সে দেখতে খারাপ দেখায় বলে, বাবু আসর সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার তুলে রাখা হয়েছে।" বলিয়া গোমস্তা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

বরকর্ত্তার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। "পাজি, ছোট লোক" বলিয়া ছুটিয়া দরজায় গিয়া দেখিলেন, ততক্ষণে বরকন্যার গাড়ী ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার গাড়ীখানা কেবল উপস্থিত আছে।

অগত্যা সেই গাড়ীতে উঠিয়া বরকর্ত্তা ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলেন।

এইরূপে বরকন্যা বিদায় করিয়া দিয়া মেসোমহাশয়ের আর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। বড় মামার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া কেবলি বলিতে লাগিলেন, "ভায়া, আমাকে কি যেমন তেমন লোক ঠাওরাও?"

মাসীমার কাছে গিয়া বলিলেন, "কি? বড় যে বল বুদ্ধি নাই, আছে কিনা দেখ্‌লে?" মাসীমা সে কথার উত্তর দিলেন না। বরের হাতে সুরোদাদার আংটী পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আংটীটী খুলিয়া নেওয়া হয় নাই, সেই আংটীর কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

মেসোমহাশয় মাকে বলিলেন, "কেমন দিদি, জাত তো যায় নাই? মেয়ের বিয়ে হোল তো?" মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মেসোমহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার গুণের ধার এ জীবনে শোধ দিতে পার্‌বো না।"

মেসোমহাশয় শুনিয়া হাহা করিয়া খুব হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা বলে আংটীর ধারটা তোমার শোধ করে দিতে হবে, তা নইলে সুরোর মা আর আমার সঙ্গে কথা বল্‌বেন না।"

আমি দেখিলাম, ব্যাপারটা তেমন সুবিধা হইল না। আমাদের এই জুয়াচুরীর ফল তরু বেচারীকে ভুগিতে হইবে। কিন্তু সে সময় আরতো কিছু উপায়ও ছিল না!

কাঁচের দোয়াত।

১

পৌষ মাসের শীত, তাহাতে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন দিনে যে আমার খিচুড়ী থাইবার বাসনা প্রবল হইবে, সে কথা আমার স্নেহময়ী খুড়িমার মনে হওয়াই স্বাভাবিক, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রন্ধনগৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলে খুড়িমা আমার জন্য নিজেই রাঁধিতেন।

দেখিলাম, খুড়িমা খিচুড়ীই রাঁধিতেছেন বটে। এত সাধের খিচুড়ী পাছে অশ্রুজলে লবণাক্ত হইয়া যায়, এই ভয়ে আগামী কল্য কলিকাতায় যাইতে হইবে, এ সংবাদ তাঁহাকে দিতে সাহস হইল না।

খুড়িমার বোধ হয় হাত পুড়িয়া গিয়াছিল, কেন না, তিনি একটু অপ্রসন্ন মুখে ছিলেন, কিন্তু রন্ধনগৃহের দ্বারে আমার আবির্ভাব হইবামাত্র তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমার দিকে চাহিয়াই তিনি বলিলেন, "হ্যারে খোকা, আজও তুই স্নান কর্‌লিনে? এত শীতের ভয় তোর? যা শীগ্‌গির তেল মেখে দীঘিতে একটা ডুব দিয়ে আয়, আমার খিচুড়ী হয়েছে, মাছটা হলেই হয়।"

আমি উনিশ বৎসর বয়সেও খুড়িমার নিকট খোকা ছিলাম। অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার এ কু-অভ্যাস দূর করিতে পারি নাই।

নির্ম্মলা রোয়াকের উপর বসিয়া শাক বাছিতেছিল, তাহাকে

বলিলাম, "নির্ম্মলা, শাকবাছা রেখে শীঘ্র আয়, তোকে একটা কবিতা শোনাব। শুনে তোকে ঠিক করে বল্‌তে হবে, কেমন হয়েছে।"

নির্ম্মলা বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে চলিল। খুড়িমা ডাকিতে লাগিলেন, "ও খোকা, খোকা, কবিতে পড়া এখন থাক্, আগে তেল নিয়ে যা, বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।" আমি সে কথায় কর্ণপাতও করিলাম না।

পড়িবার ঘরে গিয়া ডেক্সের ভিতর হইতে একখানি সুন্দর বাঁধানো খাতা বাহির করিলাম, সেখানি আমার ডায়েরী।

নির্ম্মলা লুব্ধদৃষ্টিতে খাতাখানির দিকে যে নিশ্চয়ই চাহিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সকৌতুকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও খানা কি কবিতার খাতা? কার খাতা দাদা?"

আমি বলিলাম, "বল্ দেখি কার?"

নির্ম্মলা বলিল, "আমি জানি না, তুমি বল।"

আমি যতদূর সাধ্য গাম্ভীর্য্যের আসনে আপনাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিলাম, "আমার!"

"সত্যি!" এত বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে নির্ম্মলা এই কথাটী বলিল যেন, তাহার দাদা কোন রাজ্য জয় করিয়া আসিয়াছে।

"তুমি কবিতা লিখ্‌তে পার? কি করে শিখ্‌লে?"

"পাগল! কবিতা লিখ্‌তে কি আবার শিখ্‌তে হয়, ও সব আপনা হতেই মনে আসে। দেখিস্, এখন থেকে কত কবিতা লিখ্‌বো। শোন্,—

রাণী তুমি রাণী নহ, রাজরাজেন্দ্রাণী!
তুচ্ছ এ পৃথ্বীর রাজ্য সকলি অসার।

তুমি হৃদয়ের রাণী, এ হৃদয়খানি
তব সিংহাসন! দেবী, সাম্রাজ্য তোমার।
কি গর্ব্বস্ফুরিত ওই ফুল্ল ওষ্ঠাধর;
অঙ্গে অঙ্গে কি মহিমা কি গরিমা হেরি
বন্দী চিত্ত আছে নিত্য চরণের পর,
নূপুরের মত ওই পা দু'খানি ঘেরি।
কি অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী! ললাট সুন্দর!
নয়নে করুণ দৃষ্টি কি শান্ত সুধীর!
কি গরিমা পূর্ণ ওই কাম কলেবর,
কল্পনার দেবী তুমি, নহ পৃথিবীর!
রাজেন্দ্রাণী দীনে কর তব মালাকার,
নিত্য মালা গাঁথি দিব চরণে তোমার।

কবিতা শুনিয়া নির্ম্মলা একেবারে মুগ্ধ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন হয়েছে?" সে কথা তাহার কানেই পৌঁছিল না। দেখিলাম, সে অন্যমনস্ক ভাবে জানালার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দুটী চোখের কোলে দুই ফোঁটা জল টল টল করিতেছে। ভাবিলাম, সার্থক এ কবিতা!

হঠাৎ নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী কে, দাদা?"

আমি বলিলাম, "দূর মূর্খ, ও সব কল্পনা। এত কাল কবিতা পড়িয়া আসিতেছিস্, কল্পনা সম্বন্ধে তোর একটুও জ্ঞান হইল না?"

বাস্তবিক নির্ম্মলা বারো বৎসর বয়স হইতে কেবল কবিতাই পড়িয়া আসিতেছে, উপন্যাস সম্বন্ধে তাহার বড় বেশী আগ্রহ

ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বেও যখন সে কেবল সাত আট বৎসরের, তখনই স্কুল-পাঠ্যের মধ্যে কবিতা-পুস্তকই তাহার বেশী প্রিয় ছিল। পলাশীর যুদ্ধের "ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি" ও হেম বাবুর "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে" সে এমন সুন্দর আবৃত্তি করিত যে, বাবা বন্ধু মজ্‌লিসের মধ্যে তাহাকে কবিতা আবৃত্তি করাইয়া গৌরব অনুভব করিতেন। সেই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্ম্মলাকেই আমার কবিতার যথার্থ সমালোচক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

কিন্তু যথার্থই কি কেবল কল্পনা? কবিতা কি কেবলই আকাশকুসুম, বাস্তবের বৃন্তটুকুর সহিতও কি তাহার কোন সম্বন্ধ নাই? যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহারাই এ কথার উত্তর দিতে পারেন। নির্ম্মলাকে কবিতা শোনাইবার পর এই বিষয়ের সমস্যা লইয়াই মনের মধ্যে একটা বিচার চলিতেছিল; সম্ভবত, খিচুড়ী খাইবার সময় এই কারণেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং বারবার খুড়িমার তাড়না শুনিতেছিলাম "খেতে বসে হাঁ করে ভাব্‌ছিস্‌ কি, খিচুড়ী যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।"

সে দিন সন্ধ্যা বেলা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আকাশের তারা দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, ওই যে সুদূর আকাশে জ্যোতির বিন্দুগুলি, ও গুলির অস্তিত্ব কি কেবল কল্পনায়? "রাণী"র নয়নতারার সঙ্গে আকাশের তারার তুলনা করিয়াছিলাম কিনা তাহা স্মরণ হয় না, তবে একথা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, জগৎটা আজ কাল আমার দৃষ্টিতে কেবল কবিত্বময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই কবিত্বস্রোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর দর্শনশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম

হইয়াছিল; সম্ভবতঃ বাবার সতর্কদৃষ্টি এটুকু লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

মধুর সন্ধ্যা, আকাশে তারা, হৃদয়ে কবিত্ব, এত সুখ বিধাতার সহ্য হয় না। কাজেই বাবার আহ্বানে আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

বাবা ডাকিলেন, "নির্ম্মল?"

স্বরটা অতিরিক্ত গম্ভীর। বাবা আমাদের সঙ্গে সমবয়স্কের মত খেলা, গল্প ও আমোদ করিতেন; কিন্তু যখন গম্ভীর হইতেন —বিষম গম্ভীর হইতেন। বাবার তিরস্কারকে কখনও ভয় করি নাই, কিন্তু বাবার গাম্ভীর্য্যকে বড়ই ভয় করিতাম। কিন্তু বাবা খুব বেশী বার গম্ভীর হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, বাবা প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে, নির্ম্মলাকে আর পাড়ার যত ছেলে পাইতেন, সকলকেই লইয়া গল্প করিতে বসিতেন। সে গল্প আমাদের এত মিষ্ট লাগিত যে, দু'পর রৌদ্রে কাঁচা আমও বোধ হয় তত মিষ্ট লাগে না। আমরা যখন হাসিতাম, বাবাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া উচ্চ হাস্য করিতেন, ঠিক যেন তিনি আমাদেরই একজন। লুকাচুরী খেলিবার সময় কতদিন বাবাকে বুড়ি করিয়া খেলা করিয়াছি; বাবার সঙ্গে যে খেলা করা চলে না, সে কথা কই একবারও তো মনে হয় নাই।

কিন্তু তাহারই মধ্যে বাবা যেদিন গম্ভীর হইতেন, সে দিন আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কি মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করিতাম না। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, একবার স্কুলে

কবিতাও কখন কখন হয় তো লিখি; কিন্তু ডায়েরী লেখাটা কি মন্দ? বিখ্যাত লোকেরা সকলেই প্রায় ডায়েরী লিখিয়া গিয়াছেন ও লেখেন। ইহা দ্বারা আমি এমন কথা প্রমাণ করিতে চাহি না যে, ডায়েরী লিখি বলিয়া আমি একজন বিখ্যাত লোক, তবে ডায়েরী লেখাটা যে নিন্দনীয় নহে, তাহাই প্রমাণ করিতে চাই। বাবারও ডায়েরী আছে, ডায়েরী না থাকিলে তাঁহার আড়ত কি আর চলিত? তবে বাবার ডায়েরী এমন সুন্দর বাঁধানো খাতা নয়, খেরোর মলাট দেওয়া, কান ফোঁড়া খাতা, আর তাহা কেবল ব্যাপারী ও খরিদদারের নামের তালিকা এবং দৈনিক ক্রয়-বিক্রয়ের ও আয়ব্যয়ের হিসাবেই পরিপূর্ণ। মানুষের মন বলিয়া যে কোন জিনিস আছে, তাহার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই।

খেরো বাঁধানো খাতার কথা মনে পড়িতেই মনের চিন্তার আবার আর এক শাখা বাহির হইল। খেরো বাঁধানো খাতার আনুসঙ্গিক যে কয়টা জিনিস আমি আদৌ দেখিতে পারি না, খেরো বাঁধানো খাতাকে অগ্রগামী করিয়া সেইগুলি আমার কল্পনার দরবারে হাজির হইল। আমি চোখ বুজিয়াই যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, ঘর জোড়া তক্তপোষ, তাহার উপর সতরঞ্চ ও ফরাসের চাদর, দেল্‌কোর উপর রেড়ির তৈলের প্রদীপ, হুঁকার বৈঠক, কড়ি বাঁধা হুঁকা, মেটে দোয়াতে কালী আর কান ফোঁড়া খাতা। এই সব জিনিস আমি আদৌ পছন্দ করি না, আর বাবা এই সকলেরই বিশেষ পক্ষপাতী। বাবা বোধ হয় হিসাব রাখা-টাই জগতে সকলের অপেক্ষা দরকারী বলিয়া মনে করেন। তিনি

যদি কবিতার আস্বাদ বুঝিতেন, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন, জগতের যত কিছু সার সৌন্দর্য্য, সে কেবল কবিতাতেই আছে।

আচ্ছা, এই যে আমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পড়ি, সে বুঝি কিছুই নয়? আর একটী মাত্র কবিতা লিখিয়াছি, এই অপরাধেই বাবা এত গম্ভীর হইলেন। কাল হইতে আমি দিবারাত্র কেবল কবিতাই লিখিব, দেখি বাবা কি করেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই বুঝি জীবনের সার পদার্থ, আর কবিত্বের যে অমর যশঃসৌরভ সে বুঝি কেবল তুচ্ছ জিনিস!

বাবার এই যে এক ব্যবসা বাতিক হইয়াছে, বাবার ইচ্ছা বোধ হয় আমিও তাহাতে যোগ দিই। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার হঠাৎ এই নূতন ধরণের ব্যবসার খেয়াল চাগিয়া উঠিল। এই ব্যবসার খাজাঞ্চী, কার্য্যাধ্যক্ষ, কেরাণী, সমস্তই একাধারে বাবা নিজে। হিসাব এমন পরিষ্কার থাকিত যে, কোথাও পাই পয়সার অমিল নাই। বড় বড় অঙ্ক সামান্য ভুলে কতবার মাটী করিয়াছি, বাবা কি করিয়া এত নির্ভুল হিসাব রাখেন, সে একটা ভাবিবার কথা বটে।

এই সমস্ত বিচিত্র চিন্তার মধ্যে অত্যন্ত শীত বোধ হওয়ায় চৈতন্য হইল, দেখিলাম, সম্মুখের জানালাটী খোলা আছে। জানালার দিকে চাহিয়া দেখি, নির্ম্মলার ঘরের জানালাও খোলা; এত রাত্রেও নির্ম্মলা জাগিয়া জানালার লোহার শিকের উপর মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে!

দেখিবামাত্র মনে আঘাত লাগিল। নির্ম্মলা এত রাত্রে জানালায় বসিয়া কি করিতেছে? নিশ্চয়ই কাঁদিতেছে। কতবার—

কতবার, নির্ম্মলাকে এমনি করিয়া আমি কাঁদাইয়াছি। আহা বেচারি, উহার কোন দোষ নাই। একবার মনে হইল, উঠিয়া যাই, এতরাত্রে জাগিয়া আছে বলিয়া বকিয়া দিই। কিন্তু পারিলাম না। মুক্তার মত স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুগুলি একটীর পর একটী ঝরিয়া পড়িয়া লৌহদণ্ডের অঙ্গ ভিজাইতেছে, এ দৃশ্য যেন আমি অন্ধকারেও দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, আমার মন বুঝি ওই লোহার শিকগুলি অপেক্ষাও কঠিন। জানালা বন্ধ করিতে গিয়া আর বন্ধ করা হইল না, লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

কিন্তু চিন্তা আমাকে তখনও ছাড়িল না, তিন বছরের ছোট্ট নির্ম্মলাকে সে আমার মনের সম্মুখে লইয়া আসিল। সেই একটী কেতকী রংয়ের ঘাগ্‌রা পরা, সেই ঘাড়ের উপর কালো থোপা থোপা চুল, সেই চোখের উপর চুল আসিয়া পড়িতেছে আর দুই হাত দিয়া বার বার সরাইতেছে, সেই ঠোঁটে হাসি আর চোখেও হাসি, সে কি সুন্দর! আমি তখন সাত বৎসরের, কেবল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। ছুটীর সময় নির্ম্মলা গেটের কাছে ছাড়া আর কোনখানে থাকিত না, আমাকে দূর হইতে পথে দেখিয়াই "দাদা, দাদা" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিত। খুড়িমা বলিতেন, "নাও! এখন হলো? নে, তোর বোন্‌কে নে! এ মেয়ে কি আমি রাখ্‌তে পারি? সমস্ত দিন কেবল দাদা, আর দাদা! কাল থেকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাস্‌।"

সেই একদিন মাধব পেয়ারা গাছে উঠিয়া গাছ ঝাড়া দিতেছিল, আর পাড়ার সব মেয়েরা পেয়ারা কুড়াইতেছিল। নির্ম্মলা

একটী পাকা পেয়ারা কুড়াইয়া পাইয়াছে। পেয়ারা কামড়াইয়া তাহার খুব মিষ্ট লাগিয়াছে, তাই অমনি সে পেয়ারা হাতে করিয়া ব্যাটবল খেলার মাঠ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে! বেচারী সে দিন আমার কাছে কি বকুনিই খাইয়াছিল! অনেক বকিয়া শেষে আমার একটু অনুতাপ হইলে যখন বলিলাম, "দেখি, কই তোর পেয়ারা দে," তখন নির্ম্মলা এক হাতে চোখের জল মুছিতেছে, আবার সে চোখে আনন্দের হাসি, সে যে কেমন দেখাইতেছিল! তাহার কামড় দেওয়া জায়গা আমি বাদ দিয়া পেয়ারা খাইতেছি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, ঐ খানটা বেশী মিষ্টি, ঐ খানটা খাও।"

আর একদিন আমার খুব জ্বর, রাত্রে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া আছি, কিন্তু তবুও বুঝিতে পারিতেছি, দু'খানি শীতল কোমল হাত আমার উত্তপ্ত কপালের উপর রহিয়াছে। সকালে যখন আমার জ্বর ত্যাগ হইল, তখন দেখিলাম, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সাত বৎসরের বালিকাটী শুষ্কলতার মত আমার পায়ের তলায় পড়িয়া আছে। খুড়িমা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, একি, নির্ম্মলারও যে খুব জ্বর হয়েছে! না, এ মেয়ে নিয়ে আর পারিনে। সারা রাত এমন করে জাগ্‌লে জ্বর হবে নাতো কি হবে?"

দেড় বৎসর বয়সে মাতৃহীন। বাবা নির্ম্মলাকে বুকের উপর নিয়া উঠানে পায়চারী করিতেন, এখনও আমার সে কথা একটু একটু মনে পড়ে। বাবা অনেক দেখিয়া শুনিয়া নির্ম্মলার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট কি কেহ খণ্ডাইতে পারে? উমাপ্রসাদ

সুশিক্ষিত, সুশ্রী, সচ্চরিত্র এবং সদ্বংশজাত; এই চারটী "স"-এর একত্র সম্মিলন দেখিয়া, বাবা প্রফুল্লচিত্তে তাহার হাতে নির্ম্মলাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রফুল্লচিত্তে কিনা, সে কথা ঠিক্ বলা যায় না। হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়াটা যে কি বিশ্রী জিনিস! কি না, 'আমার ছিল, এখন তোমার হাতে দিয়ে দিলাম।' তাই নাকি কেউ একেবারে দিয়ে দিতে পারে?

বিবাহের পর আমরা জানিলাম, উমাপ্রসাদ বাবু শুধু কেবল সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র প্রভৃতি নহেন, তাঁহার আরও একটী সু আছে, তিনি একজন সুকবি। তিনি নিজে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া, সুন্দর সুন্দর বাঁধানো খাতায় সেগুলি পরিপূর্ণ করিয়া "শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর করকমলে" উপহার দিতেন এবং অন্যান্য আধুনিক বিখ্যাত কবিদের কাব্যও পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লাল নীল পেন্সিলের দাগ সহ নির্ম্মলা দেবীর করকমলে উপহার প্রদানের ছলে সর্ব্বসাধারণে স্বীয় কাব্যরসাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। সেই অবধিই বাবার কবিতা লেখার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপিও উমাপ্রসাদ বাবু এত ভদ্রতায় অভ্যস্ত ও সুচতুর ছিলেন যে, প্রায় একবৎসর বাবা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারেন নাই। পরে বুঝিলাম, এবং এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম যে, পুত্তলিকাও নিপুণ হস্তের গঠনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, কিন্তু প্রাণ একটা স্বতন্ত্র পদার্থ।

আমার কবিতা শুনিতে শুনিতে নির্ম্মলার নয়নের সেই দুটী বিন্দু জল, তাহার প্রকৃত অর্থ তখন বুঝি নাই, রাত্রির অন্ধকারে

এখন বুঝিতেছি, স্মৃতির মেঘ দুটী বিন্দু মাত্র অগ্নিময় বারিতে কেমন করিয়া বহুদিনের সঞ্চিত বজ্রাগ্নির উত্তাপ ঢালিয়া দেয়। কিন্তু সেই জলবিন্দু দুটীর অর্থ যেমন আমি বুঝি নাই, তেমনি যাহার চোখের জল সেও বুঝে নাই। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "নির্ম্মলা, তুই কাঁদ্‌লি কেন?" সে সরলভাবে উত্তর দিত, "কি জানি কেন দাদা, জানি না তো।"

নির্ম্মলা কোন দিন আমার কাছে কোন জিনিস চাহে নাই, আমার কাছেই বা কেন,—খুড়িমার কাছেও সে আবদার করিয়া কিছু চাহে নাই। আমার আব্‌দারে খুড়িমা দিন রাত এত ব্যতি-ব্যস্ত হইতেন, নির্ম্মলা যে মোটেই আব্‌দার করে না, সেটা তাঁহার চোখেই পড়িত না। আমার আব্‌দার আর নির্ম্মলার শান্তশিষ্টভাব উভয়ই তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাহাতে যে কোন বিশেষত্ব আছে, সে কথা তাঁহার মনেই উদয় হইত না। কতদিন তিনি বলিতেন, "যদু কেমন লক্ষ্মী ছেলে, দেখে একটু শিখিস্‌ দেখি, রতন কেমন শান্ত, ওর দেখে দেখে একটু শান্ত হতে শেখ্‌ দেখি!" কিন্তু একদিনও বলেন নাই যে, "নির্ম্মলাকে দেখে একটু শান্ত হতে শেখ্‌ দেখি," অথবা নির্ম্মলাকেও বলেন নাই যে "তোর দাদাকে দেখে একটু আব্‌দার কর্‌তে শেখ্‌ দেখি।"

কিন্তু নির্ম্মলা আমার কাছে প্রত্যক্ষ না হোক্‌, পরোক্ষভাবে একটী জিনিস চাহিয়াছিল। সে জিনিসটী কোন মহামূল্য দ্রব্য নহে, সামান্য একটী কাঁচের দোয়াত। সেই চাওয়ার একটু ইতি-হাস আছে। সে ইতিহাস প্রায় আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আজ আবার এমন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে যে, সে যেন এই মাত্রের ঘটনা।

কাঁচের দোয়াত।

মনে হইতেছে, আবার যেন আমি সেই বারো বৎসর বয়সের বালক হইয়া গিয়াছি। যতীশদের বাড়ী, যতীশের পড়িবার টেবিলের উপর ছোট একটী গোল কাঁচের দোয়াত, নির্ম্মলা সেটী হাতে লইয়া একমনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, যেন সেটী কি আশ্চর্য্য জিনিষ! এমন সময় যতীশ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ও নির্ম্মলার হাতে কাঁচের দোয়াত দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল, "থাক্ থাক্, রেখে দে! কাঁচের দোয়াত হাতে নেওয়া হয়েছে। রেখে দে শীগ্‌গির। হাত থেকে পড়্‌লেই ভেঙ্গে যাবে, জানিসনে?"

আমি এক পাশে জানালার কাছে চেয়ার লইয়া গিয়া রবিন্‌সন্ ক্রুশোর অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত তন্ময় হইয়া পড়িতেছি, যতীশের গর্জ্জনে মাথা তুলিয়া চাহিলাম। বেচারী নির্ম্মলার মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, অতি সন্তর্পনে ধীরে ধীরে দোয়াতটী সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। নির্ম্মলার মলিন মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর যেন কি রকম করিয়া উঠিল। বলিলাম "যতীশ, হয়েছে কি, বক্‌ছো কেন ওকে?"

"দেখনা, দোয়াতটা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছিল, আর একটু হলেই ভেঙ্গে ফেল্‌তো। মাটীর দোয়াত আর খাগের কলম দিয়ে আঁকুড়ে "ক" লেখেন, ওঁর আবার কাঁচের দোয়াত নিতে সাধ হয়।"

যতীশের এই ছোট লোকের মত কথা শুনিয়া আমার ভয়ানক রাগ হইল। এত রাগ হইল যে, আর তাহার সঙ্গে কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না। রবিন্‌সন্ ক্রুশো খানি টেবিলের

উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "নির্ম্মলা, আয় বাড়ী যাই। তোকে এবার রথতলা থেকে খুব সুন্দর দেখে একটা কাঁচের দোয়াত কিনে দেব।"

কিন্তু দোয়াত কিনিয়া দিই নাই, নির্ম্মলাও আর চাহে নাই। তবে মাঝে মাঝে তাহাকে সঙ্গিনীদের কাছে বলিতে শুনিয়াছি, "দাদা আমাকে কেমন সুন্দর দোয়াত কিনে দেবে।" তারপর আমি দোয়াতের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু আবার একবার মনে পড়িয়াছিল, নির্ম্মলার বিবাহের পর। বিবাহের সময় তাহার বাক্স সাজাইবার জন্য যাহার উপর জিনিস ক্রয় করিবার ভার ছিল, সে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে দুটী দোয়াত কিনিয়া আনিয়াছিল ও তাহা দিয়া বাক্স সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্মলা দোয়াত দুটী বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাখিয়াছিল। খুড়িমা দেখিয়া বলিলেন, "ওকি রে, দোয়াত বার করে ফেল্‌ছিস্ কেন?" নির্ম্মলা বলিল, "ও দোয়াত আমি নেব না, দাদা আমাকে ভাল দোয়াত কিনে এনে দেবে।" কিন্তু নির্ম্মলার কার্য্যতৎপর দাদার এখনও পর্য্যন্ত সেই ভাল দোয়াত কিনিয়া আনিয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই।

বাবা নির্ম্মলাকে ছেলে বেলায় "বুড়ী" বলিয়া ডাকিতেন। এখনও মাঝে মাঝে "বুড়ী" বলিয়া ডাকেন। খুড়িমা বাড়ীর ভিতর থাকেন, যদি হঠাৎ বাবার সম্মুখে পড়েন, সেই জন্য বাবা তাঁহাকে, এবং আর যে সমস্ত বধূ সম্পর্কীয়া আসিয়া মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন তাঁহাদেরও সাবধান করিবার জন্য "বুড়ি, আমি যাচ্ছি, বুড়ি আমি যাচ্ছি" বলিতে বলিতে বাড়ীর

ভিতর আসিতেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে আসিবামাত্র ছেলে মহলে আনন্দের রোল উঠিত। কেবল মাত্র আহারের সময়ই প্রায় তিনি বাড়ীর মধ্যে আসিতেন, বিশেষ দরকার না হইলে অন্য সময় আসিতেন না। আহার করিতে বসিয়া বাবা "বুড়ি, বুড়ি" বলিয়া হাঁক দিতেন। "একবুড়ি পাঁচগণ্ডা, দু'বুড়ি দশ গণ্ডা, তিন বুড়ি পনেরো গণ্ডা, আয়, সব আয়।" বলিতে বলিতে তাঁহার পাতের কাছে বর্ষার দিনে পুখুরে মাছের গাঁদির মত ছেলেদের গাঁদি লাগিয়া যাইত!

সেই বাবা যদি গম্ভীর হ'ন, তাহাতে কাহার না অভিমান হয়? যাহোক, নির্ম্মলাকে বকিয়া অন্যায় করিয়াছি। যাইবার আগে কাল তাহার সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া লইতে হইবে।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম, কলিকাতা যাত্রার উদ্‌যোগ হইতেছে। তবুও কতক ভাল। বাবা যদি বলিয়া বসেন, "আর কলিকাতায় গিয়া কাজ নাই" আমার সেই ভয় হইতেছিল।

বই গুছাইয়া লইতে গিয়া দেখিলাম, ডায়েরী খানি খোলা, টেবিলের উপরেই পড়িয়া আছে, নির্ম্মলাকে কবিতা শোনাইয়া সেখানি তুলিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কবিতাটীর পাশে নীল পেন্সিলের দাগ, এবং বাবার হাতের লেখা,—"পাঠ্যাবস্থার অনুপযুক্ত।" দেখিয়া বুঝিলাম, নির্ম্মলার কোন দোষ নাই, বাবা নিজেই চোরামাল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

যাত্রাকালে খুড়িমা দুর্গার অর্ঘ্য আনিয়া মাথায় দিলেন, সেই সঙ্গে অবনত মস্তকের উপর অজস্র অশ্রু ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। নির্ম্মলা নীরবে আমাকে প্রণাম করিয়া পথের দিকে

চাহিয়া রহিল, আমি তাহাকে একটী কথাও বলিতে পারিলাম না।

বাবার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি অপ্রসন্ন নহে, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মন দিয়া পড়িও।"

বাবার সেই যাত্রাকালীন আশীর্ব্বাদ বা আদেশ ইষ্টমন্ত্রের মত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়াই মিষ্টার সান্ন্যালের নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। সে নিমন্ত্রণের প্রলোভনও যে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম, সে কেবল সেই ইষ্টমন্ত্রের শক্তিতে। পরীক্ষা নিকট বুঝিয়া মিষ্টার সান্ন্যালও বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না।

মিষ্টার সান্ন্যাল বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, "রাণী" তাঁহারই এক মাত্র কন্যা।

মিষ্টার সান্ন্যালের সহিত আমার পরিচয় এক বৎসর মাত্র। কিন্তু এই একটী বৎসর আমার জীবনের একটা নূতন যুগ। এক বৎসর আমি কত সুখে, কত দুঃখে, কত আশায়, কত আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইয়াছি, ভাবিয়া তাহার শেষ পাই না। গত বৎসর নিদারুণ বসন্ত রোগে যখন বান্ধবহীন নিঃসহায় অবস্থায় একাকী হাঁসপাতালে পড়িয়াছিলাম, বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইবার মত অথবা আত্মপরিচয় দিবার মত জ্ঞানও যখন আমার ছিল না, তখন,—সেই দুর্দ্দিনে মূর্ত্তিমতী শান্তি দেবীর মত রাণীকে আমার রোগশয্যার শিয়রে দেখিয়াছিলাম। সে দুর্দ্দিন, না সুদিন? যাহাই হউক, সে দিন কি আর জীবনে ভুলিতে পারিব?

কলিকাতায় আসিবার দুই সপ্তাহ পরে রাণীর একখানি চারি পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাকুলতা-পূর্ণ পত্র পাইলাম, দুই ছত্র লিখিয়া তাহার উত্তর দিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না।

রাত্রি ও দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কেবল আহার-নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সময় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম। যদি কখন ক্লান্তি বোধ হইত, তখন বাবার সেই কথা কয়টী মনে করিতাম, "নির্ম্মল, মন দিয়া পড়িও।"

পরীক্ষা শেষ হইলেও মেস্ পরিত্যাগ করিলাম না, ফল জানিবার অপেক্ষায় একাকী শূন্য মেসে পড়িয়া রহিলাম। খুড়িমার অশ্রুসিক্ত রাশি রাশি পত্র আসিয়া আমার ডেস্ক পূর্ণ করিতে লাগিল। অবশেষে ফল বাহির হইলে জানিতে পারিলাম, আমি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং বিলাত যাইবার বৃত্তিও পাইয়াছি।

সেই দিনই সান্ন্যাল সাহেবের বাড়ী হইতে ডিনারের নিমন্ত্রণ পাইলাম। এবার আর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিলাম না।

৪

বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছা এতদিন আমার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা যে কত প্রবল, তাহা এই সুযোগ পাইয়া বুঝিতে পারিলাম। ছেলে বেলায় রবিন্সন্ ক্রুশো পড়িতে পড়িতে দেশবিদেশ-ভ্রমণের স্বপ্ন দেখিতাম। কতদিন স্বপ্নে পক্ষিরাজের পিঠে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছি! আজ আমার সেই শৈশব-স্বপ্ন জাগ্রৎ-সত্যে পরিণত হইবার পথ পাইয়াছে। আঃ, সে কি

কম উৎসাহ! নির্ম্মলা রবিন্সন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত যেমন পেটুকের মত গ্রাস করিত, আমি যখন দেশে ফিরিয়া তাহাকে ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনাইব, তখন না জানি তাহার কি অবস্থা হইবে! উৎসাহে আমার আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, মিষ্টার সান্ন্যাল আমার এই উৎসাহ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে ত্রুটি করিলেন না। সে উৎসাহ রাণীর ম্লানমুখের দিকে চাহিয়াও ম্লান হইল না। তাহাকে বুঝাইলাম, কয়েকটী বৎসর মাত্র। প্রতি মেলে যদি পত্র পাওয়া যায়, তবে এই কয়েকটা বৎসর অতি সহজেই কাটিয়া যাইবে।

বিলাত যাইবার বৃত্তি পাইয়াছি, বাবাকে পত্রে তাহা জানাই-য়াছি। এখন বাড়ী গিয়া তাঁহার মত লইতে হইবে। "বাবা যদি মত না দেন?" চকিতের মত এ আশঙ্কা মনে উদয় হইলেও প্রবল উৎসাহের মুখে তৃণের মত তাহা ভাসিয়া যাইত।

আসিবার সময় নির্ম্মলাকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি, সে কথা আমি পরীক্ষার তাড়ার মধ্যেও ভুলিতে পারি নাই। এমন একটী জিনিস এবার তাহার জন্য লইয়া যাইব যে, সে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই খুসী হইয়া উঠিবে। সে জিনিস,—একটী কাঁচের দোয়াত!

বাজারে বাজারে ঘুরিয়া দোয়াত দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কোন দোয়াতই আমার পছন্দ হয় না। নির্ম্মলার এত দিনের দেনা, সে যে সুদে আসলে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সহজে কি তাহা শোধ হয়? তাহার জন্য কিছু পরিশ্রম করা দরকার।

বাজার ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দ্বিপ্রহর করিয়া অবশেষে ভাগ্যক্রমে আমার একটী বেলোয়ারী কাঁচের দোয়াত পছন্দ

হইল। ভারী কাঁচের তৈয়ারী একটী দোয়াত শিল্প-নৈপুণ্যে যেন হীরার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। খুড়িমার জন্য একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা কিনিলাম, এবং বাবার জন্য একজোড়া চটি জুতা।

মেসে ফিরিয়া আসিয়া খুড়িমার পত্র ও মণি-অর্ডার পাইলাম। কালীঘাটে পূজা দিবার জন্য, মদনমোহনের পূজা দিবার জন্য, দীন দরিদ্রকেও কিছু দান করিবার জন্য তিনি মণি-অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন, আরও লিখিয়াছেন, আমার প্রথম মাসের বৃত্তির টাকা গোপীনাথের ভোগের জন্য দিতে হইবে। খুড়িমা শাক্ত ঘরের বধূ হইলেও বৈষ্ণব-পরিবারের যে কন্যা, তাঁহার এইরূপ কোন কোন কথায় মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া যাইত। নির্ম্মলাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি বাড়ী যাইতেছি বলিয়া এবং নির্ম্মলারও কয়েকদিন হইল জ্বর হইয়াছে, সে কারণে তাহার শ্বশুর বাড়ী যাওয়া উপস্থিত স্থগিত আছে, সে সংবাদও দিয়াছেন। পরিশেষে, আমি যেন আর বাড়ী যাইতে একদিনও বিলম্ব না করি, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বিশেষ করিয়া সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আমি খুড়িমার কথা লক্ষ্মী ছেলের মত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলাম, এবং সেই রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ী রওনা হইলাম।

৫

ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম, ভজহরি ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমি নামিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কই? তিনি কোন্ গাড়ীতে আছেন?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার কিসের?"

"বাবু যে আপনাকে ডাক্তারের জন্য তারে খবর দিয়েছিলেন।"

"কৈ না, আমি তো তার পাই নাই!"

অসুখ কাহার এ কথাটা সাহস করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলাম না। কিন্তু বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র জানিতে পারিলাম, অসুখ নির্ম্মলার। কয়েকদিন হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল, গত রাত্রি হইতে জ্বর বাড়িয়া সে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছে।

আমি দুই দিন দুই রাত্রি তাহার মাথার কাছে বসিয়া সেই সমস্ত প্রলাপ শুনিলাম। ওঃ, সে যে কি কষ্ট!

তৃতীয় দিনে নির্ম্মলার জ্ঞান হইল। চোখ মেলিয়া সে ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার মুখ প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি অস্ফুট, অতি মৃদু, অতি করুণ ও অতি মিষ্টস্বরে সে যেন আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করিল, "দাদা!" একটী শব্দমাত্র! কিন্তু সেই একটী কথায় তাহার যত কথা বলিবার ছিল, সমস্তই বলা হইয়া গেল!

বড় ইচ্ছা ছিল, একবার নির্ম্মলার শীর্ণ হাতখানি হাতে লইয়া আদর করি, বলি, "দিদি, তোর নিষ্ঠুর দাদাকে মার্জ্জনা কর্," কিন্তু সে কথা বলা হইল না, আর সময় ছিল না।

দেখিলাম, খুড়িমা নির্ম্মলার দেহখানি বুকে করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। অনাহারে ও রাত্রি জাগরণে তিনি এত শীর্ণ হইয়াছেন যে, তাঁহাকেও যেন মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কি দেখিলাম?

কি দেখিলাম, তাহা নিজেই বুঝিতে পারি নাই। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু চোখে একবিন্দু জল আসিল না। যদি কেহ নির্ম্মলার মত বোন পাইয়া নিজে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন, সে বিদীর্ণ হৃদয়ের যন্ত্রণা কেমন! কে আমাকে ধরিয়া টানিতেছে, কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিসের আগুন জ্বলিতেছে, এত লোকজন কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছি। স্বপ্ন, স্বপ্ন,—সকলি স্বপ্ন! এ কি ভীষণ স্বপ্ন আমাকে ঘুর্ণাবর্ত্তে ডুবাইতেছে! খুড়িমা বলিতেন, "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ!" হে গোবিন্দ, আমাকে একি স্বপ্ন দেখাই-তেছ,—জাগাইয়া দাও, জাগাইয়া দাও! একবার আমার ছোট বোনটীর হাসিমুখ দেখিয়া প্রাণ পাই।

ভজহরি দুই হাত দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল ডাকিতেছে, "দাদাবাবু দাদাবাবু!" তার সেই আহ্বানে জ্ঞান পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যাহা দেখিবার সমস্তই দেখিলাম। সব শেষ হইয়া গেল। এখন ঢাল, ঢাল, কলসী কলসী জল আনিয়া ঢাল, আগুন কি তাহাতে নিবাইতে পারিবে? জোয়ার আসিল, আমার মনে হইল যেন মধুমতী নদী নিজে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিয়াছে। মধুমতী, মাগো, নির্ম্মলা যে কতদিন তোর জলে খেলা করিয়াছে, আজ তাহার জ্বরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোর শীতল কোলে কোথায় তাহাকে লুকাইয়া রাখিলি মা!

সহসা আমার আর একটী কথা স্মরণ হইল! উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

"কোথা যাও" বলিয়া অনেক গুলি বাহু আমাকে জোর করিয়া ধরিল। তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিলাম। এক নিশ্বাসে বাড়ী আসিয়া ব্যাগ হইতে সেই অতি সাধের কাঁচের দোয়াতটী বাহির করিয়া লইয়া আবার সেই ভাবেই নদীকূলে ছুটিলাম। নদীর ধারে আসিয়া কাঁচের দোয়াতও মধুমতীর জলে বিসর্জ্জন দিলাম।

৬

বাবার সঙ্গে আমার দুই দিন একেবারেই দেখা হয় নাই, তৃতীয় দিনে বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বাবার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অপরিচিত কেহই বুঝিতে পারিত না যে, সম্প্রতি তিনি কন্যাশোক পাইয়াছেন। কেহ তো বুঝিতে পারে না, সে শোক কত গভীর, যাহার উপরে বিন্দুমাত্রও তরঙ্গের চিহ্ন নাই! কিন্তু আমি বুঝিলাম, এবং আরও বুঝিলাম, নদীর নির্ম্মল জলে দিবস-অন্তে গোধূলির ছায়া পড়িয়া যেমন দেখায়, সেইরূপ তাঁহার নির্ম্মল ললাটে কি যেন ঈষৎ অন্ধকার ছায়া পড়িয়া তাঁহাকে ঠিক আর আগের মত দেখাইতেছে না।

বাবা শান্তভাবে বলিলেন, "মল্লিক-বৃত্তি লইয়া তবে তুমি বিলাত যাইবে বলিয়াই স্থির করিয়াছ?"

বাবা সহজ ভাবেই বলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে হইল, "স্থির" শব্দটীর উপর তিনি যেন একটু জোর দিলেন।

আমি প্রথমটা উত্তর দিতে পারিলাম না। বাবা কিছুক্ষণ আমার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "সান্ন্যাল সাহেবের কন্যার সহিত নিজের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ, একথাও তবে সত্য?"

বাবার দৃষ্টি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে, কাপুরুষের মত আর মৌন থাকিলে চলে না। কোনরূপে ভূমিতলে দৃষ্টি রাখিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম "হাঁ।"

"তবে সত্য—?" উত্তর পাইয়াও বাবা আবার দ্বিতীয়বার যেন আরও একটু জোরের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপ্রশ্নের শেষ শব্দ দু'টী উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "নির্ম্মল, মুখ তোল, আমার মুখের দিকে চাও। এমন কিছু অন্যায় তুমি কর নাই, যাহাতে তুমি মাথা তুলিয়া তোমার পিতার মুখের দিকে চাহিতে পার না। বরং যদি তুমি আমার ভয়ে এখন বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর, কিংবা যদি "হাঁ" বলিয়া আমার কথায় উত্তর দিয়া একথা স্বীকার না করিতে, তাহাতেই তোমার মাথা তুলিয়া চাহিবার অধিকার হারাইতে! তবে, এ কথা আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই, কি এত বড় একটা বিষয়ে আমার মতামত নেওয়াও আবশ্যক মনে কর নাই! ভাল কথা! যত দিন সন্তান নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া নিজে চলিতে না পারে, ততদিনই পিতামাতার অভিভাবকত্বের প্রয়োজন, তাহার পরে আর নহে। আমি এরূপ বিবাহ অথবা বিলাত যাওয়া পছন্দ না করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! অভিভাবকের ইঙ্গিতে চিরদিনই চলিতে হইবে, তাহার কি অর্থ আছে? মানবমাত্রেরই ভাল মন্দ বিচার করিবার একটা স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতায় কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। পিতামাতা দূরের কথা, ঈশ্বরের পর্য্যন্ত নাই, এবং ইহাই তাঁহার নিজকৃত বিধান।"

আমি মাথা তুলিয়া বারবার বাবার মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন মতেই মাথা তুলিতে পারিলাম না।

বাবাও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বোধ হয় আবার আমাকে যে কথা গুলি বলিবেন, সে কথা গুলি উচ্চারণ করিবার জন্য মনে মনে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাবা কথা বলিলেন। অতি ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দের উপর জোর দিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি ও নির্ম্মলা আমার সংসারের বন্ধন ছিলে। নির্ম্মলা গিয়াছে, তোমাকেও মুক্তি দিলাম। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, আমার মতামতের জন্য আর তোমার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বুঝিলাম, পিতা আমাকে ত্যাগ করিলেন। এত নির্ম্মমভাবে এমন করিয়া ত্যাগ করিলেন যে, আমার স্বপক্ষে আমাকে একটী কথা বলিবারও অবসর দিলেন না। বাবা যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, তবে আমিই কি আর তাঁহা হইতে দূরে গিয়া থাকিতে পারি না? আমি করিয়াছি কি? কি অপরাধে আমার এত কঠিন শাস্তি?

পিতার সহিত আমার এই কথাবার্ত্তার কিছু দিন পরে একদিন প্রভাতে বোম্বাই বন্দরে বিলাতগামী জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া সান্যাল সাহেব ও রাণীর নিকট বিদায় লইলাম; আর কেহই আমাকে বিদায় দিতে আসে নাই। মন এত ভারাক্রান্ত ছিল যে, বিদায়কালে রাণীর সেই অশ্রুসজল নেত্র, সেই ম্লানমুখ দেখিয়া একটীও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিলাম না।

সূর্য্যাস্তের রেখাগুলি মিলাইয়া গিয়া যখন চারিদিকে অন্ধকার

হইয়া আসিতে লাগিল, তখন মনে হইল, এ অন্ধকার আমাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে। জন্মভূমির স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকার নীলজল আমাকে কোন্ রহস্যময় জীবনাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল!

৭

পথে রাণী ও সান্ন্যাল সাহেবের পত্র যথানিয়মে পাইলাম, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া উদ্দেশ লইলেন, কিন্তু বাটীর কোন সংবাদ পাইলাম না। লণ্ডনে পৌছিয়াই বাবার নিকট হইতে একটা মণি-অর্ডার পাইলাম, কিন্তু বাবার হাতের লেখা একটা ছত্রও পাইলাম না। অভিমানে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া মণি-অর্ডার ফেরত পাঠাইলাম।

তার পর বহুদিন কাটিয়া গেল, বাবার আর কোন উদ্দেশই পাইলাম না। একছত্র পত্র তো নয়ই, মণি-অর্ডার পর্য্যন্ত নয়। সান্ন্যাল সাহেবের নিকট হইতে বাড়ীর সংবাদ পাওয়া অসম্ভব হইত না, কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে আমি জানাইব যে, প্রবাসী পুত্র পিতার কোন সংবাদই পায় না! বাবা আমার সংবাদ পাইতেন কিনা জানি না, হয় তো পাইতেন। কেন না, শুনিয়াছিলাম, বাবার দুই একজন পরিচিত ব্যক্তি লণ্ডনে ছিলেন, কিন্তু আমার তো সংবাদ পাইবার কোন উপায়ই ছিল না। দুর্ভাবনা ও অভিমান একখানি অতি গুরুভার প্রস্তরের মত আমার বুকের উপর চাপিয়া রহিল। ধূম্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন লণ্ডন নগরীর আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতাম, আমার হৃদয়াকাশের অবস্থা ঠিক এইরূপই শোচনীয়।

কিন্তু মানুষের মন বহুদিন একভাবে থাকিতে পারে না, ক্রমশঃ বিস্মৃতি আসিয়া তাহাকে শান্তি দেয়। প্রস্তরে অঙ্কিত শিলালিপি যেমন বহুদিন রুদ্ধগৃহে থাকিলে ধুলিজালে ক্রমশঃ তাহার বর্ণমালা অস্পষ্ট হইয়া যায়, মানবমনের পূর্ব্বস্মৃতিও সেইরূপ। মৃত আত্মীয়ের শোকের ন্যায় আমার জীবিত আত্মীয়গণের স্মৃতিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। ইহার একমাত্র কারণ নবজীবনের মাদকতা। নূতন সঙ্গ, নব অভিজ্ঞতা, নব জীবনের উৎসাহ, পুরাতন দুঃখ স্মৃতিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মানুষ স্বভাবতঃ সুখপ্রিয়; কে স্বেচ্ছায় ভস্মাবৃত অগ্নি স্মৃতিবায়ুতে পুনরুদ্দীপিত করিয়া আপনা আপনি দগ্ধ হইতে চাহে!

স্মৃতিতে দাহ আছে বটে, আবার বিমল আনন্দও আছে। ভাগ্য আমার আনন্দটুকু মুছিয়া লইয়া কেবল দাহটুকুই অবশিষ্ট রাখিয়াছিল।

রাণীর পত্রই এখন আমার জীবনের সম্বল। আমি প্রতি মেলে ডাক চাহিয়া থাকিতাম, একটীবারও আমাকে নিরাশ হইতে হইত না। প্রতি পত্রে রাণী আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কি উজ্জ্বল, কি গৌরবপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত করিয়া দিত! সে চিত্র আমার হৃদয়ে বজ্রের বল আনিয়া দিত, মস্তিষ্কে নব শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। রাণী আমাকে মনুষ্যত্বের সিংহাসনে বসাইয়া কল্পনায় মহীয়ান্ রাজপদে অভিষেক করিয়াছে, সে কল্পনা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমার উপর, এবং আমি যে তাহা নিশ্চয়ই পারিব, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিত না।

৮

দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ প্রবাসের পর আবার জন্মভূমির মুখ দেখিলাম। আমার সেই নদীবহুলা সুজলা শ্যামা জন্মভূমি! আমার সেই স্নিগ্ধ স্নেহময়ী ধরিত্রী জননী!

রাণীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে মিষ্টার সান্ন্যাল বাবার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং বাবার উত্তর পাইয়া তিনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। মিষ্টার সান্ন্যাল আমাকে বার বার বলিলেন, "নির্ম্মল, তোমার বাবা এত ভদ্র ও এত মহৎ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এই উচ্চমনা পিতার সন্তান তুমি, এই কথা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা গর্ব্বিত হইও, ও নিজের কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া লইও।" কিন্তু আমি,—আমিও সে পত্র পড়িয়াছিলাম, এবং বার বার সে পত্রের এই কয়টী ছত্রই মনে আসিয়া বাজিতেছিল, "'অনুমতি' সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে। আমার মতে প্রত্যেক পিতারই সন্তানকে শিশুকাল হইতে এইরূপ ভাবে গঠন করা প্রয়োজন যে, সে যেন তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পরে সর্ব্ববিষয়ে নিজের কর্ত্তব্য নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সমর্থ হয়, এবং সে বিষয়ে তাহাকে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে না হয়; এবং পিতারও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বাধ্যতার শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া তাহার স্বকীয় স্বাধীনতা ও শক্তিতে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার পথে বাধাস্বরূপ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে, চিরদিনই আমার এইরূপ বিশ্বাস। এই জন্য নির্ম্মলের সম্বন্ধেও আমার এইরূপ ইচ্ছা যে, সে কোন বিষয়ে যেন আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে।" বাবার এই মন্তব্যে সান্ন্যাল সাহেব

মুগ্ধ হইলেও আমি মুগ্ধ হইতে পারি নাই। আমার মনের ভিতর অভিমানের সিন্ধু সগর্জ্জনে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, যেন আমার বুকের ভিতর আর ধরে না। উপলগামিনী খরস্রোতা নদী যেমন প্রস্তরের বাধা চূর্ণ করিয়া উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়া যায়, আমার অন্তর্নিহিত অভিমানও যেন সেইরূপ আমার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছিল। কোথায়? কোন্ সাগরের অভিমুখে তাহা জানি না। কেবল আমার মনে হইতেছিল, "কি করিয়াছি? আমি এত কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি? কি অপরাধে আমার এ কঠিন শাস্তি?" পত্র পড়িবার পর জানুর উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। রাণী না আসিলে বোধ হয় আরও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। রাণী আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "এই সন্ধ্যাবেলা এমন করে একলাটী বসে কি কর্‌ছো?" আমি তখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম "কাঁদবার চেষ্টা কর্‌ছি রাণি! কিন্তু পার্‌লাম না, আমার চোখে জল আসে না।"

কিন্তু তথাপি বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর রাণীকে লইয়া আমি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলাম। পদ্মাতীরে সুন্দর বাংলা, রাণী আমার সেই গৃহের রাণী। একখানি বোট ছিল, কখন কখন নদীতে বেড়াইতাম, কেন না রাণী নৌকা-ভ্রমণ বড় ভালবাসিত। কার্য্যানুরোধেও কখন কখন দুই দশ দিন নৌকায় বাস করিতে হইত।

একবার এইরূপ নৌকা-ভ্রমণে গিয়া নৌকা আঁধিতে পড়িয়া গেল। বর্ষার শেষ, নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। কয়েক দিন অনবরত নৌকায় বাস করিয়া আমার বিরক্ত ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু রাণীর "অমৃতে অরুচি নাই।" জলের খেলা দেখিয়া, জলের কুল্ কুল্ ধ্বনি শুনিয়া তার যে কি আমোদ হয় সে কথা সেই জানে। সমস্ত রাত্রি নৌকার দোলায় দুলিতে দুলিতে মনে করিয়াছি, সকালে উঠিয়া কোন গ্রামে নৌকা লাগাইয়া মাটীতে পা দিয়া বাঁচিব। সকালে উঠিয়া দেখি, এমন কুয়াশা যে, জল কি স্থল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মাঝি দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিরুপায়ে হাল ধরিয়া রহিল, নৌকা ইচ্ছামত ভাসিয়া চলিল। তাহার পর কুয়াশা গিয়া রৌদ্রের আভা দেখা দিতে না দিতেই পশ্চিম আকাশে ভয়ানক মেঘ করিয়া আসিল। মেঘ দেখিয়া মাঝিরা সশঙ্কচিত্তে কিনারা ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কিনারা! দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল, নৌকা ঝড়ের মুখে ভাসিয়া চলিল। সেই প্রবল ঝড়ের প্রতিকূলে নৌকাকে কূলের নিকট লইয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে দেখিয়া মাঝি আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া পীরের নাম জপ করিতে করিতে কেবল হাল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভরসার মধ্যে নৌকা খুব হাল্কা, সহজে ডুবিবার ভয় নাই, তবে উল্টাইয়া যাইতে পারে। আমি যদিও সাঁতার জানিতাম, কিন্তু এই ঝড়ে উন্মত্ত তরঙ্গে সাঁতার দিয়া প্রাণ বাঁচানো একরূপ অসম্ভব। রাণী তো একেবারেই সাঁতার জানে না।

কিন্তু কি যে তাহার অদ্ভুত প্রকৃতি, ঝড় দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে যাক্, বরং আমোদ যেন আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, "দেখ, কি সুন্দর একখানা উপন্যাস হয়ে গেল। কুয়াশা, ঝড়, নদীর প্রবল তরঙ্গে ডুবু ডুবু নৌকা, এ সমস্ত ঠিক্ ঠিক্ উপন্যাসের সঙ্গে

মিলে যাচ্ছে। এখন নৌকা যদি ডোবে তা হলে কি মজাই হয়, উপন্যাসের আর তা হলে কিছুই বাকি থাকে না। আচ্ছা নৌকা যদি ডোবে, তা হলে তুমি কি কর? উপন্যাসের মত আমাকে পিঠে করে সাঁৎরাও, না সত্যি যা হয় সেই রকম কর,—সাঁৎরে নিজের প্রাণ বাঁচাও। কি কর বল দেখি?” বলিয়া আমার শঙ্কিত চিন্তাবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বালিকার মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি রাণীকে কাছে টানিয়া আনিলাম ও বোটের জানালা গুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলাম।

রাণী বলিল, “আহা কর কি? জানালা বন্ধ কর কেন? এমন অন্ধকার, এমন মেঘের শোভা, এমন নদীর ঢেউ কিছুই যে তা হলে দেখা যাবে না।”

ক্রমশঃ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিল এবং অনেক রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। একটা গ্রামের ঘাট পাওয়া গেল দেখিয়া মাঝিরা সেখানে নৌকা লাগাইল।

শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। প্রকৃতির ক্ষণপূর্ব্বের রণোন্মাদিনী কালিকামূর্ত্তির পরই এই রূপান্তর, এই জ্যোৎস্না-বিভূষণা শান্তিময়া মূর্ত্তি, বিচিত্র, অতি বিচিত্র! আমি নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্রের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছি, ততক্ষণে বহুকষ্টের পর রাণী নৌকা হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং আমাকেও ডাকিতেছে, “এস না, এই জ্যোৎস্নায় একটু চড়ার উপর বেড়াই।”

রাণী তো নামিতে গিয়া পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা মাখাইয়াছে,

আমি কি করিয়া নামি? রাণীর আদেশ অবহেলা করিতেও সাহস হইল না, অগত্যা চেয়ারে চড়িয়া চড়ায় নামিতে বাধ্য হইলাম।

এইমাত্র জোয়ার নামিয়া গিয়াছে, চড়ায় কেবল কাদা। এই কাদার মধ্যে বেড়াইয়া যে কি সুখ, রাণীই তাহা জানে। যাহা হউক, আমি বাহকস্কন্ধে চেয়ার সহিত, একেবারে কিছু উচ্চে গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম, রাণী তখনও চড়ার কাদাতেই ঘুরিতেছে।

"দেখ, দেখ, কাদার মধ্যে কি সুন্দর একটী কাঁচের দোয়াত!"

"দোয়াত?" আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কি, এ কোথায় আসিয়াছি? এ যে শিবহাটীর শ্মশান ঘাট! এখানেই তো আমার নির্ম্মলা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছি! ওই যে সেই বেলের গাছ, ওই তো সেই শিব ঘর, আর ওই তো দূরে গাছের আড়াল হইতে আমাদের ছাদের সেই চিলের ঘর দেখা যাইতেছে!

জন্মভূমি, এত দিন পরে অকৃতজ্ঞ সন্তানকে কি তুমি এমনি করিয়া কোলে নিলে!

* * *

রাণী বলিল "তোমার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আমি আর কোন খানে যাচ্ছি না।"

আমি বলিলাম "রাণী, তুমি তো জাননা, বাবা কখনই তোমাকে ঘরে নেবেন না। আমার বিলাত যাওয়ার অপরাধই বাবা এখনও মার্জ্জনা করেন নাই, এখন আমি কোন্ সাহসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাব!"

রাণী বলিল "ঘরে নেবেন না? আচ্ছা নাই নেবেন! বাহিরেও

তো নেবেন? তাঁর বাড়ীতে কি বাহিরের কাজ করার দাসী নেই?"

আমি বলিলাম "রাণী, তুমি জান না, তাই ও কথা বল্‌ছো। বাবা যা সঙ্কল্প করেন, তা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারে না। চিরদিন তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই ক'রে এসেছেন। আমার মা যে সন্ধ্যায় বাড়ী অন্ধকার করে চলে গেলেন, ঠিক তাঁর যাত্রার সময়টীতে লক্ষ্মী নারায়ণের আরতীর সময় হোলো। ঘরের লক্ষ্মী জন্মের মত ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তবু লক্ষ্মী নারায়ণের আরতীতে সে দিনও সময় উত্তীর্ণ হতে পায় নাই, বাবা তা হ'তে দেন নাই। আমি নয় বৎসর বয়সে পৈতা নিয়েছি, তাহার পর এক সন্ধ্যায় কখনও দু'বার খাই নাই। একদিন খুড়িমা লুকিয়ে তাঁর পাতের খিচুড়ী দিয়েছিলেন, বাবাকে দূর থেকে আস্‌তে দেখে খিচুড়ীর থালা হাতে নিয়ে আম বাগানে পালিয়েছিলাম সে কথা আমার এখনও মনে আছে। কুলধর্ম্মের কিংবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিন্দুমাত্র নিয়ম লঙ্ঘনকে তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেন। তার জন্য তিনি একমাত্র ছেলেকেও ত্যাগ কর্‌তে পারেন, সে তো স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছ! তবে আর কেন মিছা কষ্ট পেতে চাও। বাবা যা মনে স্থির করেছেন, তোমার কি আমার, কারো স্নেহেই তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌বেন না।"

আমি যতক্ষণ কথা বলিতেছি, ততক্ষণে রাণী অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে। আমিও চলিলাম। প্রতি পদক্ষেপে পা কাঁপিতেছিল, আমার বুকের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম!

তখনও সামান্য অন্ধকার আছে। পূর্ব্বে বাবা এ সময় কাছারী

ঘরের রোয়াকের উপর কম্বলের আসনে বসিয়া থাকিতেন। এখন কি করেন জানি না। তথাপি ধীরে ধীরে সেই রোয়াকের দিকে কোনরূপে পা দুটীকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। রোয়াকের সম্মুখেই ফুলবাগান। গাছতলায় শিউলী ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, আর শিশির ঝরিয়া ফুলের উপর পড়িতেছে। আমি আর নির্ম্মলা প্রতিদিন ভোর বেলায় এই গাছতলায় ফুল কুড়াইতাম।

ছায়া দেখিয়া বাবা চম্‌কিয়া "কে ও?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বাবা, আমি" বলিয়া রাণী গিয়া তাঁহার পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল। বাবা স্থির প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন; আমিও শিউলী গাছের তলায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

প্রভাতের প্রথম আলো তখন গাছের শিশিরসিক্ত পত্রগুলির উপর খেলা করিতেছে। বাবা একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবনত করিলাম, বাবার দৃষ্টিতে যে কি লেখা ছিল তাহা পড়িতে সাহস করিলাম না।

রাণী বাবার দুই পা জড়াইয়া তাহার উপর মুখ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চোখের জলে যে বাবার পা ভিজিতেছিল তাহা আমি না দেখিয়াও অনুমান করিয়াছিলাম। একবার রাণী অশ্রুসিক্ত মুখ অল্প তুলিয়া বলিল "বাবা!" সে শব্দটী যেন আর্ত্তনাদের মত শুনাইল।

"বাবা, আমাকে কি আপনি ঘরে নেবেন না বাবা?" এ যে একেবারে ঠিক্ নির্ম্মলার আব্‌দারের সুর! একি, রাণী এ সুর কোথায় শিখিল?

"কেন নেবনা মা আমার!" কি স্নিগ্ধ, কি গম্ভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর! বাবার গলার স্বর আমি কতদিন—কতদিন শুনি নাই, সে স্বর যেন আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

খিড়কীর দুয়ার ঈষৎ খোলা ছিল। সেই খোলা দুয়ারের ফাঁক দিয়া আমি খুড়িমার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। খুড়িমা ঘড়া নিয়া, ঘোমটা দিয়া ঘাটের পথে চলিতেছিলেন,—আগেও তিনি এই সময়ই ঘাটে যাইতেন। একজন দাসী আসিয়া তাঁহাকে কি যেন বলিল, কৌতুহলী হইয়া খুড়িমা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাহিরে কি হইয়াছে দেখিতে আসিলেন। পরমুহূর্ত্তেই,—যে. খুড়িমার গলার আওয়াজ কি পায়ের শব্দও বাবা জীবনে কখনও শুনিতে পান নাই, তাঁহার ত্বরিত আবেগকম্পিত উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনিলাম "ওরে ভব, শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, আমাদের বৌমা এসেচে—ওরে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছে।"

উচ্চ শব্দে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সে শঙ্খধ্বনির অন্তরালে আমি যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনধ্বনি শুনিলাম "নির্ম্মলা, বাড়ী আয়রে মা আমার, এতদিনের পর তোর দাদা ফিরে এসেছে রে!" সে অস্ফুট ক্রন্দন সত্য কি আমার মনেরই প্রতিধ্বনি তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। কাঁচের দোয়াতটী তখনও আমার হাতেই ছিল।

স্বয়ম্বরা।

১

হরিপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালার সম্মুখের বারান্দায় একখানি চৌকির উপর বসিয়া বিনোদ দিগন্তের সীমানায় তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং মনোরমা ফুলবাগানে একটা কামিনীগাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিল।

তখন. শীত-প্রভাতের মধুর রৌদ্র কেবলমাত্র তরুশিরের পত্রগুলি রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালাটীর চারিপাশে বন্য গুল্ম ও ছোট বড় শাল পলাশগাছে আচ্ছন্ন সমতল প্রান্তর; গুল্ম ও শালগাছের পাতার আড়ালে এখনও কুয়াশা লুকাইয়া আছে, মাঠের পরে আকাশের সীমা পর্য্যন্ত কুয়াশার সম্পূর্ণ অধিকার।

বিনোদ হরিপ্রসন্ন বাবুর আশ্রিত এবং মনোরমা হরিপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র আদরিণী কন্যা। অবস্থাগত পার্থক্যের মত উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। বিনোদ যেমন শান্ত, নম্র ও সংযতস্বভাব, মনোরমা তেমনই অবাধ্য, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, তথাপি এই দুইটী বিরোধী প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে স্নেহের অর্ঘ্য দিয়া চিরসাথী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে বিনোদ যখন পিতার দারিদ্র্যক্লেশ নিবারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহ হইতে বাহির হয়, তখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। দুশ্চিন্তায় ও পথশ্রমে রেলগাড়ীর ভিতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কখন যে তাহার পথের

যৎসামান্ত সম্বল টিকিটখানি অপহৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রত্যুষে টিকিট পরীক্ষকের আহ্বানে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিল এক অজ্ঞাত স্থানে সে নিঃসম্বল, এবং প্রবঞ্চনার অপরাধে অভিযুক্ত। সেই বিপদের মধ্যে হরিপ্রসন্ন বাবুর সদাপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ মুখখানি প্রথম তাহার চোখের উপর পড়িয়াছিল।

সে দিনও এমনই শীতের প্রভাত, এমনই কুয়াশা। হরিপ্রসন্ন বাবু তাহার হাত ধরিয়া যখন ফুলবাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ এত কাঁপিতেছিল যে সে আর পথ চলিতে পারিতেছিল না। মনোরমা বাগানে ফুল তুলিতেছিল, পিতাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল এবং বিনোদের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা, এ যে শীতে কাঁপছে বাবা! নাও, আমার এই গায়ের কাপড়খানি গায়ে জড়িয়ে নাও।" বলিয়া নিজের গায়ের বনাতখানি লইয়া অসঙ্কোচে বিনোদের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। বিনোদ কে, ও কোথা হইতে আসিতেছে, সে বিষয়ে একটী প্রশ্নও করিল না।

হরিপ্রসন্ন বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে কন্যা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাবতী হয়, কিন্তু কোন রকমেই সে বিষয়ের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে বিনোদের আগমনে কন্যার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হরিপ্রসন্ন বাবু কতক নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিনোদের দৃষ্টি যখন দিগন্তের সীমা হইতে সংসারের সীমায় অবতীর্ণ হইল, তখন বিনোদ কামিনীতলায় দণ্ডায়মানা মনোরমাকে দেখিতে পাইল। ছাত্রীকে শাসন করিবার অধিকার বিনোদের

ছিল, অতএব সে ডাকিল "মনোরমা উঠে এস, সকাল বেলায় এত ঠাণ্ডা না লাগিয়ে ঘরে গিয়ে একটু পড়াশুনায় মন দাও।"

মনোরমা বলিল "এখন আমি যাবো না।" এরূপ উত্তরই মনোরমার পক্ষে স্বাভাবিক, এজন্য বিনোদ তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, কিন্তু তাহার গলার স্বর শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল।

বিনোদ দৃঢ়স্বরে ডাকিল "মনোরমা উঠে এস।" মনোরমা সে কথায় কিছুই উত্তর দিল না। বাধ্য হইয়া বিনোদকেই ফুলবাগানে নামিতে হইল।

বিনোদ মনোরমার নিকট আসিয়া দেখিল, যেমন অল্প অল্প বাতাসে নাড়া পাইয়া কামিনীগাছের পাতা হইতে বড় বড় শিশিরের ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে, তেমনি মনোরমার চোখের পল্লব হইতে বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, লাল ঠোঁট ও গালদু'টী আরও বেশী লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া বিনোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে তোমার?" বিনোদ তিন বৎসরের ভিতর মনোরমাকে কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাকে ওরূপ ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিলে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের মনে বিপ্লব বাধিবার একান্তই সম্ভাবনা। কিন্তু বিনোদের ভাবে তাহার কিছুই বোধ হইল না, সে রুক্ষস্বরে বলিল "মানু, ঘরে যেতে বলছি শুনতে পাচ্ছনা কি?"

মনোরমা বিনোদের আদেশে পড়িবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় চোখের জলে অথবা শিশির জলে ভিজা এক খানি ছোট পত্র বিনোদের হাতে দিয়া গেল।

২

সেদিন আহারের ঘণ্টা পড়িবার পরও বিনোদকে আহারের ঘরে অনুপস্থিত দেখা গেল। আহারের ঘণ্টাটী হরিপ্রসন্ন বাবুর সাহেবী চাল চলনের একটী উদাহরণ।

তিন চার বৎসর পূর্ব্বে এ পরিবারে রন্ধন ব্যাপারে বাবুর্চ্চিরই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সময়ক্রমে শ্রীমতী অন্নপূর্ণার হিন্দুয়ানীতে অনুরাগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চ্চির ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিপ্রসন্ন বাবুর এক বিধবা জ্ঞাতি ভ্রাতৃবধূর অন্নবস্ত্র সংস্থানের উপায় হইয়াছিল। বিধবা ভ্রাতৃজায়ার নাম যোগমায়া; নিতান্ত শান্ত স্বভাব ও সকলের উপরেই মমতা, এই দুইটী তাঁহার স্বভাবের প্রধান গুণ বা দোষ।

হরিপ্রসন্ন বাবু আহারের ঘরে বিনোদকে অনুপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "বিনোদ আসে নাই ?" তাহার পর বিনোদকে ডাকিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। চাকরকে হুকুম করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

বিনোদের ঘরের দরজা রুদ্ধ ছিল, হরিপ্রসন্ন বাবুর আহ্বানে বিনোদ দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল। হরিপ্রসন্ন বাবু বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একি বিনোদ তোমার চোখ এত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে কেন ?"

বিনোদ ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সর্দ্দি লেগে বড় মাথা ধরেছে।" জ্ঞানোদয়ের পর বিনোদ বোধ হয় এই প্রথম মিথ্যা বলিল।

হরিপ্রসন্ন বাবু একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় খুব

ঠাণ্ডা লেগেছে, যে রকম চোখ লাল হয়েছে, জ্বর হতে পারে। যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমি এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

বিনোদ বিষণ্ণভাবে ঘরে ফিরিয়া গেল; বালিসের নীচে হইতে মনোরমার লেখা সেই ছোট পত্রখানি বাহির করিয়া যেন কোনও দুর্ব্বোধ ভাষায় লিখিত পত্র পাঠ করিবার মত একাগ্রচিত্তে তাহার এক একটী অক্ষরের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছোট পত্রখানিতে এই কয়টী কথা লেখা ছিল, “বিনোদ, বাবা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।”—বিনোদ সকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত বার বার পড়িয়াও এই দুইটী মাত্র ছত্রের অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না!

বৈকালে বিনোদ অন্নপূর্ণার ঘরে গেল। অত্যন্ত সংযত-স্বভাব হইলেও সমস্ত দিনের মানসিক বিপ্লবে তাহার প্রফুল্ল মুখকান্তি কিছু ম্লান হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন “এ কিরে বিনু, এক দিন না খেয়ে তুই হয়েছিস্ কি?”

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল “একেবারে না খাওয়া নয় মা, দুবাটী চা—আর পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খেয়েছি।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন, “তোকে আর হাস্‌তে হবে না বিনু, তুই হাস্‌ছিস্ না কাঁদছিস্? কি হয়েছে সত্য করে বল দেখি?”

বিনোদ অন্নপূর্ণার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়া একেবারে আত্ম-গোপন করা অসম্ভব মনে করিল। বলিল “একটা যৎসামান্য কিছু হয়েছে। তোমাকে বাড়ী যাবার কথা বলেছিলাম তা কি ভুলে

গিয়েছ ? আমি পরশু দিন বাড়ী যাব স্থির৷ করেছি ; একেবারে স্থির না কর্‌লে আর যাওয়া হবে না।”

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন “এই বুঝি তোর জ্বর আর সর্দ্দি! ওঁর যেমন কীর্ত্তি, ছেলেটাকে শুধু শুধু পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়ালেন! বাড়ী যাস্ যাবি, সাম্‌নে পৌষ, মাঘের প্রথমেই বোধ হয় মানুর বিয়ে হবে, ফাল্গুনে এলাহাবাদে পরীক্ষা দিয়ে ঐ পথে একেবারে বাড়ী চলে যাস্।”

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল “না মা, তা হবে না।”

অন্নপূর্ণা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন “থাকা হবে না ? যেতেই হবে তোকে ?”

বিনোদের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। নতমুখে বলিল “হাঁ মা। আর যাতে আমার যাওয়া হয় তোমাকেই তার ঠিক করে দিতে হবে।” ইতিমধ্যে হরিপ্রসন্ন বাবু শুভসংবাদ বহন করিয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, “অনু, সব ঠিক হয়ে গেল, মাঘের প্রথমেই বিবাহ স্থির হয়েছে। সম্বন্ধটা যে এত শীঘ্র স্থির হয়ে যাবে তা মনেও ভাবিনি। ছেলেটী এম্ এ পড়্ছে, স্বভাব চরিত্রও তেমনি ভাল, বড় ভাইটুটীও কৃতী, আর ভবেশ বাবু নিজে তো মাটীর মানুষ। তিনি আমাকে দেনা পাওনার কথা মুখেও আন্‌তে দিলেন না।”

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “দেনা পাওনার কথা মুখে আন্‌বার বিশেষ দরকারও ছিল না, মনে নিশ্চয়ই জানেন যে ফাঁকিতে পড়বেন না, আমাদের যা কিছু আছে সবই মনোরমার।”

হরিপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "তা যাই হোক, ভবেশ বাবু যে হরিদ্বারে বেড়াতে এসেছিলেন এটা আমাদের উপর ভগবানের বিশেষ কৃপা বলতে হবে। না হলে তুমি ভেবে দেখ তো অনু, এই উত্তর পশ্চিমের প্রান্তে মনোরমার জন্য সুপাত্রের সন্ধান কোথায় পাওয়া যেতো? যা হোক্ অনেক দিনের দুশ্চিন্তার পর এবার নিশ্চিন্ত হতে পার্‌বো।"

৩

বিনোদ চলিয়া গেল। যোগমায়া ও অন্নপূর্ণা একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন।

যোগমায়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "দিদি, মানুকে কেন বিনোদের হাতে দিলে না? এমন সুপাত্র তুমি আর কোথায় পাবে? ধন সম্পত্তির কথা যদি বল, তবে সে যে ছেলে, সে যদি বেঁচে থাকে, নিশ্চয় একটা মানুষের মত হবে।"

অন্নপূর্ণার মুখে একটা কালিমার ছায়া পড়িল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "সে হবার নয়, বিনোদেরা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ।"

"কায়স্থের আবার উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম কি? কায়স্থ তো বটে! যদি সামান্য কিছু গোল হ'ত, বড়ঠাকুর মনে করলে কি মিটিয়ে দিতে পার্‌তেন না?"

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার মনের ভিতরের চিন্তার রেখা নির্ম্মল ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতেছিল।

বিনোদ বিদায় লইবার সময় মনোরমাকে ডাকে নাই। মনোরমা তখন পড়িবার ঘরে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া গাড়ী চলিয়া যাইবার শব্দ শুনিতেছিল। ক্রমে গাড়ীর চাকার

শব্দ মৃদু ও মৃদুতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল; তখন তাহার শূন্য হৃদয় যেন একান্ত অবলম্বনহীন হইয়া একটা কিছু আশ্রয় খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

টেবিলের উপর একটী স্ফটিক নির্ম্মিত কোণ্‌ভাঙ্গা কাগজচাপা পড়িয়া ছিল, মনোরমা সেটা তুলিয়া লইয়া অতি আগ্রহের সহিত বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর তাজমহলের একটী সুন্দর ছবি ছিল, নানা দিক হইতে তাহা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। দেখিতে সুন্দর বলিয়া গত বৎসর বিনোদ তাহাকে সেটী কিনিয়া দিয়াছিল। মনোরমাকে বিনোদের সেই প্রথম ও শেষ উপহার! সেই সামান্য বস্তুটিতে যে কত দিনের কত কাহিনী, কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত শিক্ষা জড়িত হইয়াছিল অন্যে তাহা জানিত না। একবার অসাবধানে টেবিল হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার একটা কোণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পশ্চিম দিকের সূর্য্যকিরণ সেই ভাঙ্গার উপর পড়িয়া যখন তাহাকে নানা বর্ণে সাজাইতেছিল, তখন মনোরমার মনের ভিতরেও এই তিন বৎসরের কত ইতিহাস উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

কত ইতিহাস! কিন্তু সে ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য কোন ঘটনাই ছিল না। বিনোদ মনোরমাকে অনেক শাসন করিয়াছে, কিন্তু "মানু লক্ষ্মিটী, একটু শান্ত হও দেখি" কি "দুষ্টামীটা একটু কমাও দেখি" ইহা ভিন্ন আর কোন দিন মনোরমাকে কোন আদরের কথা বলিয়াছে বলিয়া মনোরমার স্মরণ হয় না। স্মরণ করিতে গেলে সেই সকাল বেলায় বিছানা হইতে উঠা, সেই চা খাওয়া, তারপর পড়া দেওয়া এবং প্রতিদিনই পড়া তৈয়ারী না

হইবার জন্য বকুনি খাওয়া, এই সবই কেবল মনে পড়ে। বিশেষ ঘটনার মধ্যে, কোন দিন বই হাতে করিয়া ভোলার সঙ্গে বাগানে ছুটা ছুটী করিতে করিতে ভুলিয়া ইঁদারার ধারে বই রাখিয়া আসিয়াছিল, ও রাত্রে বৃষ্টি হইয়া বই ভিজিয়া গিয়াছিল, কোন্ দিন মা ঘুমাইলে চুপি চুপি তক্তার উপর হইতে তেঁতুল-কাসুন্দী পাড়িতে গিয়া জলের কলসী উল্টাইয়া ফেলিয়াছিল, কোনদিন বা বাবার সঙ্গে সহস্রঝোরা দেখিতে গিয়াছিল এই মাত্র; কিন্তু জলে যেমন সূর্য্যের কিরণ রামধনুর রং ফলায়, স্ফটিকের কাগজ-চাপাটীতে যেমন সূর্য্যের কিরণ রং ফলাইতেছে, এই তিন বৎসরের প্রতি দিনের সামান্য ঘটনাগুলিও যেন সেইরূপ আজ কি জানি কোন্ সূর্য্যের কিরণে রামধনুর বিচিত্ররঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

কাগজ-চাপার নীচে বিনোদের ছোট একখানি খাতা ছিল। বিনোদ ভুলিয়া খাতাখানি ফেলিয়া গিয়াছিল। মনোরমা দেখিয়াছিল বিনোদ প্রতিদিন এই খাতায় কি যেন লিখিত। মনোরমা খাতাখানির সমস্ত পাতা উল্টাইয়া দেখিল সবই ইংরাজী লেখা, মনোরমার কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই, কেবল সেই সমস্ত ইংরাজী লেখার মধ্যে একছত্র মাত্র নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া বাংলা লেখা আছে "পবিত্রতা মৃত-সঞ্জীবনী, যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সেই নব জীবন লাভ করে!"

৪

পৌষ মাসের ছোট বেলার দিন কাজে কর্ম্মে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, মনোরমার মনে হইতে লাগিল দিনগুলি যেন রেলগাড়ীর

মত দৌড়িয়া চলিতেছে ; মাঘ মাস আসিবার আশঙ্কায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

হরিপ্রসন্ন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "অনু, মনোরমা এখন কেমন শান্ত হয়েছে ; সমস্ত দিন পড়্‌বার ঘর ছাড়া আর কোথাও তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।"

পৌষ মাস শেষ হইবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া মনোরমা আর থাকিতে পারিল না। এক দিন সন্ধ্যার সময় মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা, আমার বিয়ে দিও না।"

মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "ও আবার কি কথা!"

২রা মাঘ মনোরমার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, এজন্য নানা কাজে হরিপ্রসন্ন বাবুর সময় আজকাল খুবই কম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর কিছু অপটু, ও সেই সঙ্গে মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল! বিনোদ কাছে নাই বলিয়া যেন তাঁহার সকল কাজেই অসুবিধা বোধ হইত।

একদিন সকাল বেলা অন্নপূর্ণা স্বামীর নিকট আসিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন "মানু কোথায় গেল? সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

হরিপ্রসন্ন বাবু ইজিচেয়ারে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন "সে কি, কূয়ায় পড়ে যায় নি তো?"

মনোরমাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অন্নপূর্ণা দুইমাস হইতে মনে যে সংশয় পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিলেন।

হরিপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "এত দিন কেন বল নাই ?"

অন্নপূর্ণা অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিলেন "এমন যে হবে তা' কি আগে বুঝতে পেরেছিলাম !" অনুতাপে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

লোকে যে বিষয়টা একেবারেই অসম্ভব মনে করে সেটা সহসা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইয়া যায় তাহা বলা যায় না। মনোরমা কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই, ষ্টেশন বহুদূরে, কোন পথে ষ্টেশনে যাইতে হয় তাহাও সে জানিত না। বিনোদের গ্রামের নাম ও কোন ষ্টেশনে নামিতে হয়, তাহা মনোরমা বিনোদের নিকট শুনিয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত যে কখন কোন প্রয়োজনে লাগিবে তাহা মনে কল্পনাও করে নাই।

ষ্টেশন মাষ্টার মনোরমার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন "তুমি একা কোথায় যাবে মা ?"

মনোরমা বলিল, "আমার স্বামীর অসুখ, আমাকে যেতেই হবে।"

মনোরমার সেই উন্মাদিনীর ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া সে কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইল না।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছায়ার মত চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কোন্ কোন্ ষ্টেশনে উঠিতে ও নামিতে হইবে ষ্টেশন-মাষ্টার তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি সে মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মনে রাখিতেছিল। আহার ও নিদ্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহার কোন চৈতন্যই ছিল না।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া অসহায়া সুন্দরী বালিকার পথে কত বিপদের সম্ভাবনা, কিন্তু মনোরমার সে সমস্ত কিছুই ঘটিল না। জগতে সৎ

ও অসৎ উভয় শ্রেণীর লোকই আছে, কিন্তু যে কেহ তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল সেই বিস্মিত হইতেছিল, তাহাকে কোন কুকথা বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

৫

সন্ধার পর জমীদার বিনোদবিহারী বাবুর বৈঠক বসিয়াছে। বিনোদবিহারী বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সভ্যতা সম্বন্ধে আদর্শ দেখাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন, অতএব তাঁহাদের সুমার্জ্জিত বিচার-শক্তির অনুকুলতায় বৈঠকখানার শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য ভদ্রলোকের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছিল, কেবল রমণীকণ্ঠের সুমার্জ্জিত স্বরলহরীর অভাবে অন্তকার সভাস্থলীতে সমস্তই বিরস বোধ হইতেছিল।

সভাগৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর অদর্শনজনিত মনের বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য বিনোদবিহারী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধের গুণে ক্রমে সকলের মন প্রফুল্ল হইল। চতুর্দ্দিকের দেয়ালগিরির আলোকরশ্মি কাচের গেলাসের উপর পড়িয়া আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতে লাগিল। গেলাসের ঠুন্ ঠুন্, তবলার মৃদু আওয়াজ এবং গীতে বাদ্যে ও বক্তৃতায় সভা ক্রমে আনন্দময় হইয়া উঠিল। নৃত্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য বন্ধুবর্গের কেহ কেহ আপনার পায়ে-ঘুঙুর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় দুয়ার খুলিয়া আকস্মিক বিদ্যুৎরেখার মত এক অপূর্ব্বসুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা সভাস্থলে প্রবেশ করিল। বিনোদ বাবুর বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিয়া সকলে শৃগালবিনিন্দিত স্বরে একত্রে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

বালিকার সঙ্গে যে লোকটী আসিয়াছিল সে তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশায়িত, শটকাহস্ত, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র বিনোদ বাবুকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ যে বিনোদ বাবু!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে মনোরমার পায়ের নীচে হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া গেল। "একি, এতো নয়!" বলিয়া মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

জমীদার মহাশয় আলস্যবিজড়িত স্বরে, "এত গোল কিসের?" বলিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র উন্মীলিত করিলেন। সম্মুখে উপবাস-ক্লিষ্টা, রুক্ষকেশা দীনা মনোরমার উন্মাদিনীর ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া "এ কি!" বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কে যেন তীব্র কষাঘাতে গভীর নিদ্রা হইতে তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। অতি যন্ত্রণার সঙ্গে বিনোদ বাবুর মুখ হইতে "ও!" এই শব্দটী আর্ত্তনাদের ন্যায় বাহির হইল।

"এ যে দেবী জগদ্ধাত্রী! এ নরককুণ্ডে তুমি কেন মা!" বলিতে বলিতে বিনোদ বাবুর মস্তক আপনা হইতেই মনোরমার পদপ্রান্তে অবনত হইল।

৬

বেলা প্রায় নয়টা, হরিপ্রসন্ন বাবু ফুলবাগানে বেড়াইতেছিলেন। পনেরো দিনে হরিপ্রসন্ন বাবুর বয়স পনেরো বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ডাক হরকরা ডাক দিয়া গেল। হরিপ্রসন্ন বাবু একখানি অপরিচিত হাতের লেখা পত্র দেখিয়া সকলের আগে সেই পত্র

খানিই খুলিলেন ; তখন তাঁহার মনে আশা বা আশঙ্কা কোনটী যে প্রবল হইয়াছিল, মুখের দিকে চাহিয়া তাহা কিছুই বুঝা যাইত না।

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল ;—শ্রদ্ধাস্পদেষু, মহাশয়, আমি আপনার নিকট অপরিচিত, কেন না ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ অথবা লিপিযোগে আলাপ পরিচয় ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দৈববশতঃ আমার ভাগ্যক্রমে আপনার সাবিত্রীরূপা কন্যাকে আমি জননীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি এবং সেই সূত্রে অপরিচিত হইয়াও আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতেছি।

শ্রীমান্ বিনোদবিহারী রায় আমার স্বগ্রামবাসী ও প্রতিবেশী, তাঁহারই গৃহের অনুসন্ধানে মা ভ্রমক্রমে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এখন এই গৃহেই আমার স্ত্রীর পরিচর্য্যায় অবস্থান করিতেছেন। মা যখন গৃহত্যাগ করিয়া আসেন তখন অন্য পাত্রে সমর্পিতা হইবার আশঙ্কায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিলেন, এখন নিজকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়াছেন। ভরসা করি আপনারা তাঁহার সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনার নিকটে আমার আরও একটী নিবেদন আছে, এ বিষয়ে আমার ধৃষ্টতা ও অতিরিক্ত সাহস ক্ষমা করিবেন। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি সপরিবারে একবার দীনের ভবনে পদার্পণ করিয়া এই স্থান হইতে মাকে যথাবিধি স্বামীহস্তে অর্পণ করিবেন, আমি তাহা দেখিয়া জীবন সার্থক করিব। এবিষয়ে আপনার কিরূপ অনুমতি পত্রোত্তরে জানিতে ইচ্ছা করি। নিবেদনমিতি—

প্রণত শ্রীবিনোদবিহারী রায় চৌধুরী।

সন্ন্যাস।

১

আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহার পূর্ব্বেই আমি কিঞ্চিৎ ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে যখন দাদা পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া একটু আপত্তি তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে গলদশ্রুলোচনা পিসিমাকে অবস্থিত দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে সম্ভাবিত আপত্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

পিসিমা বলিলেন, "ওকি আমার অদৃষ্টে বাঁচ্‌বে? তাতে আবার ওর লেখা পড়ার জন্য এত শাসন! এবিয়েতে আর অমত করো না বাবা; মেয়েটি সুন্দরী, বিয়েটা হলে আমিও নরুর ছেলে মেয়ের মুখ দেখে সুখে মর্‌তে পারি।"

অতএব পিসিমার এই কথায় প্রতিপন্ন হইল পিসিমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, এবং তাঁহার অদৃষ্টের দোষেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প তখন লেখা-পড়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এবং বিবাহটা একান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ যখন মেয়েটী সুন্দরী। এ পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল; কিন্তু আমার ছেলে মেয়ের মুখ দেখিয়া মরা পিসিমার পক্ষে এত সুখকর কেন, সেইটিই বুঝিতে আমার কিছু গোলমাল ঠেকিতে-ছিল।

যাহা হউক, দাদা এই সকল অমোঘ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন

আপত্তি উত্থাপনের সাহস করিলেন না। অতএব নির্ব্বিঘ্নে সুষমার সহিত আমার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু এ হেন পিসিমার বর্ত্তমানেও যে জীবনটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় তাহা পরে জানিয়াছিলাম!

আমার বৌদিদির অনেক দোষ ছিল। প্রথম দোষ তিনি সর্ব্বদাই হাস্যমুখী; তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বোধ হইত তিনি হাসিতেছেন। মেয়ে মানুষের এত হাসি কেন? পিসিমার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি, তিনি কত গম্ভীর! তা ছাড়া, বৌদিদির অন্যান্য দোষেরও সীমা ছিল না। বৌদিদির দোষেই পিসিমা অন্যমনস্ক হইয়া পা দিয়া দুধের বাটি প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেন, হাত হইতে তেলের ভাঁড় পড়িয়া যাইত, পিসিমা দুধ জ্বাল দিতে গেলেই বৌদিদির দোষে কড়ার সমস্ত দুধ উথলাইয়া পড়িত। মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়? কাজেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটিলে পিসিমা বৌদিদিকে তিরস্কার করিতেন; তা বৌ ঝির দোষ দেখিলে শাসন না করিলে কি চলে? তাহাতেই পাড়ার দগ্ধাননীরা পিসিমাকে বৌকাঁট্‌কি বলিত। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি পিসিমা যখন শাসন করিতেন, বৌদিদি তখন তাঁহার সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া ভিজে বেড়ালটির মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন (এ উপমাটি পিসিমা প্রদত্ত)। তখনও তাঁহার মুখ তেমনি হাস্যময় দেখিতাম। বৌদিদির সর্ব্বাপেক্ষা দোষ, তিনি আমার উপর সর্ব্বদা গুরুগিরি করিতেন। আমি তাঁহার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হইলেও হইতে পারি, তাই বলিয়া মেয়ে মানুষের কাছে উপদেশ লইতে হইবে নাকি? একে বৌদিদির উপদেশ, তারপর আবার দাদার বকুনি! কথা

বলিতে তো খরচ লাগে না, কাজেই দাদা অনর্গল বকিয়া যাইতেন। (এ কথায় যেন কেহ মনে না করেন—দাদা কৃপণ)।

দাদার সেই সমস্ত বাক্যব্যয়ের ফলে আমি যে দিন দাদার কিছু খরচ বাঁচাইতাম, অর্থাৎ খাইতাম না, এবং পিসিমাও অনাহারে থাকিতেন, সেদিন বৌদিদি বেচারীরও অগত্যা খাওয়া হইত না।—দেখিয়া শুনিয়া সংসারে আমার নিতান্ত বিরাগ উপস্থিত হইল।

তখন পিসিমা বৌদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাগা বৌমা! তোমাদের কেমন আক্কেল বল দেখি?" বৌদিদি শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, "কি হয়েছে পিসিমা?" "হবে আবার কি? চোখে কি কিছু দেখ্‌তে পাও না? নরু আমার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্চে, বে দিলে, তা বৌ আন্‌বে না? আজ যদি শাশুড়ী থাক্‌তো, তো দেখ্‌তে পেতে নরুর বৌয়ের কত আদর! আহা, নরু আমার বাঁচবে, তার আবার বৌ হবে, একথা স্বপনের অতীত।" শেষ কথার সঙ্গে পিসিমার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল।

বৌদিদি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি তো পিসিমা, আন্‌বার কথা বলেছিলাম; তা ঠাকুরপোর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে—"

"পরীক্ষা তো ফাল্গুন মাসে! তা বলে তদ্দিন ঘরের বউ ঘরে আন্‌বে না?"

২

দিন দেখিয়া ২।৩ দিন পরে সুষমাকে বাড়ী আনা হইল।

লোকে বলিত, "আহা দুটি জায়ে কেমন ভাব, যেন মায়ের পেটের বোনের মত দুটিতে আছে।"

কিন্তু পিসিমা সর্ব্বদাই বলিতেন, "ওর শাশুড়ী নেই, ওকে আর কে যত্ন করবে? বউ? বউতো কেবল রাত দিন খাটিয়েই নিতে পারে, তা না করে খাওয়ার যত্ন, না করে মাথ্‌বার যত্ন।"

বৌদিদি শুনিয়া হাসিতেন। সুষমা কি ভাবিত জানি না; কিন্তু দেখিতাম সে রোজ বিকালে পিসিমার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিত, এবং রাত্রে তাঁহার পায়ে তেল মাখাইত; সন্ধ্যাবেলায় বৌদিদি যখন রাঁধিতেন তখন তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইত সুষমা নিতান্ত বোকা। বারো বৎসর বয়সেও তাহার এ জ্ঞানটুকু হইল না যে, অমূল্য জীবনটা, পাকাচুল তুলিয়া, পায়ে তেল ঘসিয়া ও রান্নাঘরে গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য নহে। তবে, বৌদিদির বুদ্ধির পরিচয়ও কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম; শনি ও রবিবারে দুপুর বেলায় যখন সুষমা খোকাকে লইয়া আদর করিতে মহা ব্যস্ত থাকিত, তখন বৌদিদি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আমার ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিসিমাও কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বৌমার তো বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি আছে!"

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, একে তো স্ত্রীলোকমাত্রেই বোকা, তার উপর সুষমা আবার বিষম বোকা; আমার মত ব্যক্তির জীবনের সহচরী হইবার জন্য উহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন। অতএব দোকানে গিয়া একখানি দ্বিতীয় ভাগ ও একখানি কথামালা কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বই দেখিয়াই অরুচি ধরিয়া গেল; বলিল "এ আমি পড়্‌তে পার্‌বো না।" দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ও কথামালা 'সচিত্র' হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তাহা হইলে, সুষমা পড়ুক বা না পড়ুক অন্ততঃ ছবিও দেখিত।

পাঠে উৎসাহিত করার মুষ্টিযোগ আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। আমি বলিলাম "তুমি যদি একমাসের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করতে পার তো তোমাকে একটা জিনিস দেবো।"

তৎক্ষণাৎ সুষমার কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল! "কি জিনিস বলনা" বলিয়া সাগ্রহে আমার মুখের দিকে চাহিল।

কি জিনিস? দূর ছাই! জিনিসের নামও যে মনে পড়ে না। কাজেই বলিলাম "কি জিনিস বল দেখি? যদি বলতে পার তা হলে আর একটা জিনিস দেবো।"

সুষমা হাসিয়া বলিল "আর, আরও একটা যে কি জিনিস তা যদি বলতে পারি তা হলে আরও একটা জিনিস দেবে, কেমন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিছুই দেবেনা, আমাকে কেবল ভোলাচ্ছ।"

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, যদি এখনই আমি বলি "তোমার জন্য একটা ঘাগরাপরা পুতুল আন্‌বো" তাহা হইলে আর সুষমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। হায়, এইরূপ মূর্খা—যে পুতুল খেলা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না, কি উপায়ে তাহাকে আমি আমার জীবনসঙ্গিনীর যোগ্যা করিয়া লইব?

কিন্তু ক্রমশঃ বোধ হইতে লাগিল, সুষমা নিতান্ত বোকা নয়। খনির গর্ভে হীরকের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে কিছু জ্ঞানরত্ন আছে, একটু ঘসিয়া মাজিয়া লইতে পারিলেই হয়। তবে বৌদিদির সঙ্গে

তাহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার ভয় হইত সেও বা বৌদিদির নিকট হইতে গুরুগিরি বিদ্যাটা শিখিয়া ফেলে! আমি মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছিলাম সে গুলি কাটিয়া ফেলিলাম, এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে সুষমাকে রাত্রে ও মধ্যাহ্নে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এদিকে আমার পরীক্ষার সময়ও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

৩

সে দিন বৌদিদি সুষমাকে লইয়া কাহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। দাদা আফিসে গিয়াছেন, ছেলেদের গোলমাল নাই, বাড়ী নিস্তব্ধ; বাহিরের ঘরে ক্ষুদিরাম চাকর নাক ডাকাইতেছে, পিসিমার ঘরে পিসিমা মালা হাতে করিয়া ঢুলিতেছেন, এবং আমার ঘরে আমি কলেজ-পলাতকরূপে নীরবে খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছি, আর আমার সম্মুখে সুষমার কথামালা ও মানে লেখার খাতাখানি সুষমার বিরহে কালীর দাগ গায়ে মাখিয়া মলিন ভাবে পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, "সজল নিবিড় ঘন, সরস বরষা।" বৃষ্টিবিন্দুগুলি আকাশ হইতে ঝরিয়া পাতায় পাতায় পড়িতেছে, আবার পাতা হইতে ঝরিয়া কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে পড়িতেছে,—তাহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সুষমার বই ও খাতাখানির দিকে দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রী অনুপস্থিতা, কি আর করি? মানের খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া মনে মনে নিজের শিক্ষকতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, মানের খাতার এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে কি লেখা আছে। পাঠ্য পুস্তকে বাজে

কথা লেখা অন্যায়; এ বিষয়ে সুষমাকে কত শিক্ষা দিয়াছি, তথাপি ছাত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম, "এই বুঝি তোমার জিনিস কিনে দেওয়া? আমি ত এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছি।" অবশ্য, যে শিক্ষক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া পরিশেষে পুরস্কার প্রদানের কথা বিস্মৃত হন তিনি দোষী বটে এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা কোন ছাত্রীরই কর্ত্তব্য নহে।

রাত্রে সুষমাকে বলিলাম, "কেমন নিমন্ত্রণ খেলে?"

"কেমন আবার!"

"নিমন্ত্রণ খেতে খেতে এতদিন যা শিখেছ সেগুলিও তো খেয়ে ফেল নি? মানে লেখার খাতা খানি একবার নিয়ে এস দেখি!"

সুষমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন?"

"কেমন লিখেছ দেখ্‌বো।"

সুষমা বলিল, "সে হারিয়ে গিয়েছে।" স্ত্রীলোকের নীতিজ্ঞান কি কম! স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

প্রাতে উঠিয়া প্রথমে পিসিমার শরণাপন্ন হইলাম ও পরে বাজারের দিকে চলিলাম। আমার বাসস্থান মুঙ্গের, এখানে একটু অনুসন্ধান না করিলে সহজে প্রার্থিত দ্রব্য মিলে না। বাড়ী ফিরিতে বেলা ১২টা হইয়া গেল। পিসিমা ভাবিয়াছিলেন, আমি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছি; অতএব তিনি কাঁদিতেছিলেন, এবং সেটা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেদিন যে মাসের শেষ শনিবার তাহা আমার স্মরণ ছিল না,

কাজেই দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমার মত সাহসীরও হৃদয় বিচলিত হইল।

দাদা জলদগম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "নরেন!" বুঝিলাম বড় সুবিধার কথা নহে। ভয়ে ভয়ে দাদার নিকটস্থ হইলাম; ছেলে-বেলার গুরুমহাশয়কে স্মরণ হইতে লাগিল, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম, দাদা কখনই আমাকে বেত মারিবেন না।

আমি দাদাকে রাগ করিতে জীবনে দু'তিন বারের বেশী দেখি নাই; আজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম দাদা রাগ করিয়াছেন। রাগ করিলে দাদা অধিক কথা বলিতেন না, আজও বলিলেন না। দুই চারি কথার পর শেষে বলিলেন, "পরীক্ষা দিয়া যতদিন পাশ না হইতে পার, ততদিন আমার সম্মুখে আসিও না।"

প্রবেশিকাসাগর সন্তরণ দিয়া পার হওয়া আমার দুঃসাধ্য। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইয়া শেষে শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম; তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুষমা উবুড় হইয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া শুইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, বোধ হয় তাহার জ্বর হইয়াছে, নতুবা সে এ অসময়ে শুইয়া থাকিবে কেন?

সুষমাকে ডাকিয়া বলিলাম, "সুষমা ওঠ, তোমার জন্য কি এনেছি দেখ!" সুষমা উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ মুখ লাল হইয়াছে ও চোখের পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে, সম্ভবতঃ জ্বরটা খুব বেশীই হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির কি কৌতূহল! এত জ্বরেও সে কি আনিয়াছি তাহা দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিল!

আমি পকেট হইতে একটী ভেল্‌ভেটের কৌটা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম, তাহার মধ্যে দুটী কানের দুল ছিল।

ছোট একটী সোনার পাখী একটী ফলের থোকা মুখে লইয়া উড়িতেছে ; পাখীর পাখা ছোট ছোট চুণী দিয়া সাজানো, ফলগুলি মুক্তার ফল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই দুল দুটী মনোনীত করিয়াছিলাম ।

সুষমা দুল দেখিয়া সবেগে উঠিয়া বসিল ও আমার হাত হইতে বাক্সটী ছিনাইয়া লইয়া টেবিলের নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দুল দুটী স্থানচ্যুত হইয়া দূরে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল।

৪

পর দিন বৌদিদিকে বলিলাম, "বৌদিদি, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখন আমার পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আনিয়ো।" বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বৌ কাছে থাক্‌লে পরীক্ষা দেওয়া যায় না, এ জ্ঞান তোমার কবে থেকে হ'ল? সুষমার সঙ্গে কাল বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে, না?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ছি বৌদিদি, এ সব গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করা ভাল নয়।"

বৌদিদি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না, বোধ হয় সুষমার নিকট ব্যাপার জানিতে গেলেন। বৌদিদি সম্ভবতঃ দাদাকে একথা বলিয়া থাকিবেন, কারণ তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন দেখিলাম। কিন্তু সুষমার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া পিসিমার অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল।

মন অত্যন্ত উদাসীন হইয়া উঠিল, বাজারে গিয়া একখানি 'বেদান্তদর্শন' কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল। আমি ঘরে

বসিয়াছিলাম, বৌদিদি সুষমাকে সেখানে রাখিয়া গেলেন ; দেখিলাম সুষমা কাঁদিতেছে !

সুষমাকে বলিলাম, "সুষমা, আমি যদি মরে যাই, তুমি কি আমাকে মনে রাখ্বে ?" সুষমা কোন উত্তর দিল না, চোখের জলটা আরো বেশী বাড়িল দেখিলাম ; কিন্তু আমার উপায় কি ?

ভাবিলাম সংসার মায়াময়, এ মায়ার বন্ধন হইতে যাহাতে শীঘ্র মুক্তি পাইতে পারি তাহাই করিতে হইবে।

সুষমা গিয়া বৌদিদিকে প্রণাম করিল, বৌদিদি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বৌদিদির চোখেও জল পড়িতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

বারাণ্ডায় বসিয়া পিসীমা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছিলেন, "পূজা সমুখে, এমন সময়ে কে কোথায় ঘরের বৌ পাঠায় ? নরুর মা যদি বেঁচে থাক্তো, তা হলে কি এমন দিনে বৌ পাঠাতে দিত ? আমি কে, যে আমার কথা ওরা শুন্বে ?"

গাড়ী চলিয়া গেল, জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তারপর শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। তখনও ঘরখানি কি এক সৌরভে পরিপূর্ণ! সে কি সুষমার অঙ্গসৌরভ, না তাহারই স্মৃতি, সৌরভের মত আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে ? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "মায়া ! সমস্তই মায়া !" তাহার পর টেবিলের উপর হইতে 'বেদান্তদর্শন' খানি আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

আমার ধর্ম্মভাব যে পূর্ব্ব হইতেই একটু প্রবল ছিল, দীর্ঘ

কেশরাশিই তাহার প্রমাণ। কিছুদিন ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সুপ্ত ধর্ম্মবৃত্তি আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল।

বৌদিদিকে বলিলাম, "আমি আর মাছ খাইব না।" বৌদিদি বলিলেন, "পরীক্ষায় পাশ দিতে হ'লে বুঝি মাছও ছাড়্তে হয়!"

আমাদের একটী প্রকাণ্ড ছাত্রসমাজ ছিল, সভ্য সংখ্যা সতেরো জন। সভার সভাপতি আমি স্বয়ং। সভায় প্রস্তাব করিলাম, "প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া হিমাচলে গিয়া ভগবানের ধ্যান করা অনেক ভাল। কেন না, পরীক্ষা দিয়া অসার উপাধিলাভে বাহিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করা হয় মাত্র; তদপেক্ষা, যাহা একমাত্র সার সেই ভগবানের চরণ লাভের উপায় চিন্তা করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত।"

আমার এই সাধু প্রস্তাবে চৌদ্দটি সভ্য সম্মতি প্রকাশ করিলেন, আর তিন জন যদিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না কিন্তু এ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

জল খাবারের পয়সা জমাইয়া ক্রমশঃ চৌদ্দখানি কম্বল সংগ্রহ করা হইল, এবং চৌদ্দটি ত্রিশূলের জন্য কামার বাড়ী বায়না দেওয়া গেল। চুল ছাঁটা বন্ধ করিলাম, কাজেই চুল ক্রমে লম্বা হইতে লাগিল। এইরূপে সন্ন্যাসের পূর্ব্বসূচনা আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পাঠ্য পুস্তকগুলিকে ডেস্কের মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিয়া 'বেদান্তদর্শন' ও 'গীতা' পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

৫

আমাদের সন্ন্যাসসভাটি ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ত্রিশূল প্রস্তুত হইয়া আসিল, গৈরিক বস্ত্রও সংগৃহীত

হইল। চৌদ্দখানি ত্রিশূল যখন সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল, আমাদের উৎসাহও সেই সঙ্গে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর ব্রহ্ম-অন্বেষণে গমনের জন্য মন ততই উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল! কোন ক্রমে এখন এই পথটা অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে গিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেই হয়। অবশেষে একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে ডেস্কের উপর একখানি কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল,—

"কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে'—
তাঁহারই উদ্দেশে চলিলাম।"

যখন আমরা চৌদ্দজন তরুণ সন্ন্যাসী নিশীথের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ ধরিলাম, সে সময়টার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। সেই নীরব রাত্রি, সেই নীরব পৃথিবী, সেই নীরব আকাশে নক্ষত্ররা নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। মনে হইতেছিল যেন দেবতারা তারার আলোকে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গিয়া কেবলই পথ হারাইতে লাগিলাম। ধরা পড়িবার ভয়ে সোজা পথ ছাড়িয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়াছিলাম, ইচ্ছা ছিল জঙ্গল পথে চলিয়া ক্রমশঃ নেপালের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুকের ভয় ও অনাহারে মৃত্যুর ভয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মপথে বিঘ্ন অনেক, তাহা না হইলে যে গৃহকারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত অসীম অরণ্যে ঘুরিতেছি, ব্রহ্মচিন্তার পরিবর্ত্তে সেই

গৃহকারাকূপের চিন্তা সর্ব্বদাই মনে উদয় হয় কেন ? বুঝিলাম, মায়ার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ নহে। আবার, কয়েক দিন বনভ্রমণের পর পায়ে এত ব্যথা হইল, যে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। অগত্যা তখন ষ্টীমারপথে চলাই উচিত মনে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টিকিট ক্রয় করিবার জন্য কম্বল কয়খানি বিক্রয় করিতে হইল!

ষ্টীমারে আসিয়াও বিপদ অল্প নহে। যাত্রীগণ হাঁ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয় তাহারা আমাদের সেই ভস্মাবৃত তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কোন অসাধারণ দীপ্তি দেখিতে পাইয়াছিল, নহিলে অমন করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে কেন ? দুই একটা সাহেব যেন আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল; আমার আশঙ্কা হইল হয় ত তাহারা আমাদের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেছে। এই জন্য, আমাদের পলায়ন সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও খবরের কাগজ পড়িবার সাহস হইল না।

রাজঘাটে ষ্টীমার থামিল। দেখিলাম, জন কতক লোক ষ্টীমারে উঠিলেন, সারেংএর সঙ্গে তাঁহাদের কি কথা হইল। আমি রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সারেং হাত বাড়াইয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিল। লোকগুলি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমাদের কাছে আসিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নাম বলিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই ?"

আমি উত্তর করিলাম, "সন্ন্যাসীর পরিচয়ে প্রয়োজন কি ?

"সম্ভবতঃ আপনারা মুঙ্গের থেকে আস্‌ছেন ?"

"হইলেও হইতে পারে।"

তখন তিনি আমার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিলেন,—সেটি দাদার টেলিগ্রাম !

৬

অবশেষে কিনা বিশ্বাসঘাতক উমেশ আমাদের ধরাইয়া দিল ! হায়, কোথায় গেল এতদিনের সন্ন্যাসের সাধ ? আবার কিনা গৃহ-পিঞ্জরে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইল ! ধরণীকে মনে মনে বলিলাম, "তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি, তাহা হইলে আর আমাকে দাদার নিকট মুখ দেখাইতে হইবে না।" কিন্তু পৃথিবী আমার মিনতি শুনিলেন না ; কলেরার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সেও আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল ; বিষ কিম্বা ছুরীরও কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না ; অগত্যা সুস্থ শরীরে আবার সেই চিরপরিচিত বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী হইতে নামিলাম। পিসিমা "ওরে বাপ নরুরে ! এমন করে কি প্রাণবধ করে যেতে হয় রে !" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

দাদা একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "এখন একটু কান্নাকাটি থামাও। খেয়ে দেয়ে হতভাগাটা আগে ঠাণ্ডা হোক, তার পর যত পার কেঁদো।"

যাহা হউক, অনেক দিনের পর বৌদিদির হাতের রান্না খাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল।

আহারান্তে বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে কি ?"

"যাও যাও বৌদি! তোমরা ও সব কথা কি জান্‌বে?"

"তা জানি আর নাই জানি, কিন্তু চেহারাখানি তো বেশ সন্ন্যাসীর মতই করেছ দেখ্‌ছি! পা ছুখানিরই বা বাহার বেরিয়েছে কি!"

বৌদিদির এই কথা শুনিয়া মনে করুণরসের আবির্ভাব হইল; সকরুণভাবে পথের দুর্দ্দশার কাহিনী বৌদিদির নিকট বর্ণনা করিলাম।

* * * *

পর বৎসর পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। যে দিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সেদিন সেই ভেল্‌ভেটের বাক্সটী লইয়া গিয়া আবার আমি সুষমার হাতে দিলাম, বলিলাম "সুষমা এবারেও কি ফেলে দেবে?" সুষমা হাসিয়া দুল কানে পরিল, বলিল "মা গো মা, কি মিথ্যে কথা! এর নাম বুঝি জিনিস? এ তো কানের দুল!"

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি হাস্যমুখী বৌদিদি আমার সম্মুখে!

বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো! সন্ন্যাসী হয়ে তো 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে না, এখন ঘরে বসে বোধ করি কিছু সন্ধান পেয়েছ।"

পিসিমা সে দিন অনেক ব্রাহ্মণ খাওয়াইলেন ও হরির লুট দিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই, যে দাদা সেদিন আদর করিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন।

মধুপুরে।

মধুপুরের সেই বাড়ীটার কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে।

এক কম্পাউণ্ডের ভিতর চারি পাঁচখানা বাড়ী ছিল। তাহার ভিতর যে দুখানা খুব কাছাকাছি, তাহার একখানাতে তোমরা থাকিতে আর এক খানাতে আমরা থাকিতাম। বাড়ীর সম্মুখেই ফুলের বাগান, সে বাগানে খুব বড় বড় গোলাপ ফুল ফুটিত। বাগানের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকুরে রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তুমি আর আমি সেই বাগানে সমস্ত সকাল বেলা—সমস্ত দুপুর বেলা কত ছুটাছুটি করিতাম, কত খেলা করিতাম। কোন কোন দিন ফুল তুলিয়া তোমাকে সুন্দর করিয়া সাজাইতাম, সাজাইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দেখাইতাম; মা হাসিয়া বলিতেন "ঠিক যেন পরিদের মেয়ে।" তখনকার তোমার সেই লজ্জাবিজড়িত সুন্দর মুখখানি যেন আমি এখনও চোখের উপর দেখিতে পাই। সেখানে সেই যে তিনমাস, সে তিনমাস কি আনন্দেই কাটিয়াছিল! কি আনন্দেই শীতকালের ছোট ছোট দিনগুলি ফুরাইয়া যাইত, সে কয়টী দিনের কথা আর এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমিও বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিবে না। তবুও গতকথা তুলিতে ভাল লাগে বলিয়া আর একবার সে দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম।

তাহার কতদিন পরে আবার সেই মধুপুর! বাড়ীর সম্মুখে যখন

পাল্কী থামিল, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এ যে সেই বাড়ী। সে বাড়ী কি আর ভুলিতে পারি? তখন মনে যে কি ভাব হইল তাহা তোমাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। পাল্কী হইতে নামিয়া ধূলি পরিপূর্ণ বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে নিকটের সেই বাড়ীখানি (সেই তোমাদের বাড়ী) দেখিতে লাগিলাম। আমার তখন মনে হইতেছিল, বুঝি তোমরা এখনও ঐ বাড়ীতেই আছ। আমাকে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার স্বামী আমার কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন "রেলগাড়ীর ঝাঁকুনীতে বুঝি তোমার মাথা ঘুর্ছে? একদিনে রেলগাড়ী চড়্-বার সাধ কিছু কমেছে কি? এখন খুকীকে ধর, ও ভারী কাঁদ্ছে।" আমার মোহভঙ্গ হইয়া গেল। দেখিলাম, স্বামীর হাতে ক্যাসবাক্স, আর কোলে খুকী। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া খুকীকে কোলে নিলাম।

এ যাত্রায় কেবল আমরা চারিজন আসিয়াছিলাম। আমি, আমার স্বামী, আমার দিদিশাশুড়ী, আর ঊষারাণী। ঊষারাণীকে পূরা একজন না ধরিলে সাড়ে তিনজন বলা যায়। দেশের চাকর বামুন কেহই আমাদের সঙ্গে আসে নাই, সে জন্য প্রথম দিনকতক খুব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতেই খুকীর ঝি ব্যারাম হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ঊষা দুই তিন দিনের ভিতরেই নূতন চাকরদের সঙ্গে এমন ভাব করিয়া লইল, যেন তাহারা কতদিনের চেনা। তাহা হইলে কি হয়, উনি তো নূতন চাকরের কাছে খুকীকে রাখিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। দিনের ভিতর কতবার খুকীর

খোঁজ লইতে আসিতেন, আমি এক একদিন ভাবিতাম এই খোঁজ নেওয়ার সংখ্যাটা গুনিয়া খাতায় টুকিয়া রাখিব। তাঁহার এইরকম অতি সাবধানতার জন্য আমি কত যে আমোদ করিতাম, আবার মাঝে মাঝে বিরক্তও হইতাম। বলিতাম "তোমার সবই বাড়াবাড়ি", শুনিয়া তিনি কেবল হাসিতেন। খুকীর হাতে দু'গাছি বালা ছিল, সে বালা দু'গাছি যে কয়দিন হাতে ছিল সে কয়দিন তাঁহার তাড়নায় আমার আহার নিদ্রা রহিত হইয়া আসিয়াছিল। সুন্দর গোল গোল হাতে বালা দু'গাছি এমন মানাইত, কিন্তু তা হইলে কি হয়? খুলিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া তবে প্রাণ বাঁচিল।

মধুপুরে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইলেও শেষকালে বেশ ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। দিদিমার যে কেমন সুচীবাই তাহাতো তুমি জানই। তিনি আমাদের এদিকে বড় একটা আসিতেন না। মালা হাতে লইয়া তাঁহার কোণের ঘরটীতেই সদা সর্ব্বদা থাকিতেন। একজন বামুন ছিল, সে কেবল দিদিমার রাঁধিবার জল তুলিয়া দিত; আমি তাহাকে রাঁধিতে দিতাম না, নিজেই রাঁধিতাম। কে সেই ময়লা কাপড় পরা ভূতের মত নোংরা হিন্দুস্থানী বামুনের হাতের রান্না খাইবে? তা'ছাড়া আমার স্বামী নিজে যে কাজের লোক, কাজ ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ভালবাসিতেন না, আমি শুধু আলসেমী করিয়া কোন লজ্জায় দিন কাটাইব! তিনি এক এক দিন বলিতেন "খুকীকে নিয়ে তোমার রাঁধতে কষ্ট হয়, কাজ কি? এখানে তো রাঁধতে এসনি, বেড়াতেই এসেছ, যদি রান্নাঘরেই দিন কাটাবে তবে বেড়াবে

কখন?” আমি বলিতাম “আমার মাঠে হাওয়া খাওয়ার চেয়ে রান্নাঘরে ধোঁয়া খাওয়াই ভাল লাগে। কোল্‌কাতায় গিয়ে তো আর এমন করে রাঁধ্‌তে পাব না।” তিনি আমার কথা শুনিয়া যে খুব প্রফুল্ল হইতেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম। তিনি খাইতে খাইতে বলিতেন “এ তরকারীটা এমন সুন্দর হয়েছে।” “এ মোচার ঘণ্টতো জন্মেও ভুল্‌তে পার্‌বো না।” “তুমি এমন রাঁধ্‌তে শিখ্‌লে কোথায় বল দেখি!” ইত্যাদি। তাঁর সে সমস্ত কথা শুনিয়া আমার যে কি আনন্দ হইত, তাহা প্রকাশ করা যায় না। লজ্জায় ও আনন্দে আমার মন অভিভূত করিয়া তুলিত; মনে মনে ভাবিতাম, এই আনন্দের স্বাদ পাইয়াই সেকালে মেয়েরা অক্লান্তভাবে অত বড় বড় যজ্ঞের রান্নাও রাঁধিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আমরা নিজের দোষেই সে সৌভাগ্য হারাইতে বসিয়াছি।

তোমরা যে বাড়ীতে ছিলে, সেই বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ কর্ত্তা এবং বৃদ্ধা গৃহিণী, তাঁহাদের পুত্র ও পুত্রবধু, আর একটী নাতি, এই তাঁহা-দের পরিবার। বৌটীর বয়স চৌদ্দ পোনর বৎসরের বেশী হইবে না, কিন্তু তারই কোলে একটী দেড় বছরের ছেলে। কর্ত্তা পঁচিশটী টাকা পেন্‌সন্‌ পান, ছেলে কোন সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, তাঁহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। কিন্তু ছেলের অসুখ, কাজেই তাঁহারা ঋণ করিয়াও মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। আমি এক একদিন দুপুরবেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। বৌটী তো আমাকে দেখিয়া এক গলা

ঘোমটা টানিয়া দিত, অগত্যা গিন্নির সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হইল। গিন্নি ভারী সাদাসিদে ও ভালমানুষ, আমার কাছে বসিয়া তিনি সংসারের অনেক সুখ দুঃখের গল্প করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গিন্নির কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার কথা বলিয়া সময় সময় অনেক কাঁদিতেন, আর আমাকে বলিতেন "মা তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন অনুপমাকেই ফিরে পেয়েছি।" গিন্নি বেশ হাসিখুসী ভালবাসিতেন আর আমুদে স্বভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু যে দিন ছেলের জ্বর বেশী হইত সেই দিন তাঁহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া যাইত। সর্ব্বদাই আমার নিকট বলিতেন "মা, অনুকে হারিয়ে আমি অতুলের মুখ দেখে সংসারে আছি। কি যে বাছাকে ম্যালেরিয়ায় ধরলে, ভগবানের মনে কি আছে মা, কিছু জানি নে।" সুখের বিষয়, মধুপুরে আসিয়া দিন দিনই অতুল বাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছিল।

আমাদের প্রতিবেশীরা আসিয়া অবধি ঊষার তো বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধই রহিল না। অতুল বাবুর ছেলেটী যদিও ঊষার চেয়ে কেবল ছয়মাসের ছোট, তবু সে যেন ঊষার একটী খেলিবার পুতুল হইল। ছেলেটী ভারী শান্ত, ঊষা তাহাকে লইয়া বিড়াল ছানাটীর মত টানাটানি করিত, তবু সে ঊষাকে ভালবাসিত। ঊষা তাহার কাছ হইতে চলিয়া আসিলেই সে কাঁদিতে আরম্ভ করিত। আমার স্বামী, খুকী যে সর্ব্বদাই ও বাড়ীতে থাকে তাহা জানিতেন, তবু মাঝে মাঝে আসিয়া বলিতেন "ঊষা কোথায়?" না হয় তো বলিতেন "সমস্ত দিনই কি ও বাড়ী থাক্‌বে, নিয়ে এস তাকে।" তবে মধুপুরে আসিয়াই তাঁহার মনোনীত কাজ

জুটিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য বাড়ী থাকিতে তত সময় পাইতেন না। ঢেঁকী যেমন স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে, তিনি তেমনি মধুপুরে আসিয়াও নাড়িটেপা ভুলিতে পারেন নাই। সকাল হইতে কেবল লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন, কে কেমন আছে, কাহাকে কি ঔষধ দিতে হইবে ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মধুপুরে রোগীরও অভাব ছিল না, আর ডাক্তারেরও তেমন সুবিধা নাই, বিশেষ অমন বিনা ভিজিটের ডাক্তার পাইলে আর কে ছাড়িয়া দেয়। কোন কোন দিন যদি কাহারও বেশী অসুখ হইত সে দিন রাত্রেও বাড়ী আসিতে পারিতেন না, সারারাত্র সেই থানেই কাটাইয়া দিতেন। আর বাড়ী আসিলেই আমাকে যাহা বলিবেন তাহা আমার আগে থাকিতেই জানা থাকিত "অমুকের জন্য একটু পল্‌তার ঝোল করে পাঠিয়ে দাও, বেচারী একলা অসুখ নিয়ে বিদেশে পড়ে আছে, দেখ্‌বার লোক কেউ নেই।" "অমুকের জন্য একটু সাগু করে দাও" ইত্যাদি। তা ছাড়া আবার স্বদেশী চর্চ্চাও ছিল। যে দিন যাহার বাড়ীতে গিয়া স্বদেশীপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইত সে দিন বেলা দু'টা হইয়া গেলেও তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনেই পড়িত না, ঘরে ভাত শুখাইতে থাকিত, দিদিমা তো রাগিয়া খুন হইতেন।

রাখীবন্ধনের আগের দিন আমার সমস্ত দিনটা নানা কাজে কাটিয়া গেল। আমার চর্‌খাটা সঙ্গেই আনিয়াছিলাম, চর্‌খার সুতা হলুদ দিয়া ছোপাইয়া অনেক রাখী তৈয়ার করিলাম, রেশমী সৌখীন রাখী আর অত কোথায় পাব বল। সে দিন ওঁর বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল, তাহার পর কথায় বার্ত্তায়

আরও অনেক রাত্রি হইয়া গেল। শেষে এমন হইল যে ঘুম আর কিছুতেই আসে না। শেষ রাত্রে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম কিছুই জানিতে পারি নাই।

তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস কর না, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। অনেক সময় দেখিয়াছি আমার স্বপ্ন এমন ঠিক্ ঠিক্ ফলিয়া গিয়াছে যে তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। সে দিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি যে,—তোমাকে আর কি লিখিব—আমার এত চোখে জল আসি-তেছে যে কলম ধরিতে পারিতেছি না। স্বপ্নে দেখিতেছি, ঊষা-রাণী যেন হাতে একগোছা রাখী নিয়া দু'খানি সোনার পাখা বাহির করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। তখন যেন সূর্য্য সবে মাত্র উদয় হইয়াছে, তাহার সোনার আলো খুকীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই আলোতে ঊষাকে এত সুন্দর আর এত উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে ঊষাকে আর আমার ঊষা বলিয়া মনে করিতে সাহস হইতেছে না। আমি এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিব তাহাই ভাবিতেছি। খুকী যেন আমার দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে আধ আধ স্বরে বলিল "মা, রাখী বাঁধ্‌তে যাচ্ছি।" অমনি কোথা হইতে আমার কাণে একটা গম্ভীর স্বর আসিল "পৃথিবীর সহিত স্বর্গের রাখীবন্ধন!" তখনই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, ঊষা আমার কোলের কাছেই শুইয়া আছে।

সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা কিছুই মনে ছিল না। যখন বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম তখনও খুব ভোর, কুয়াশার ভিতর হইতে সূর্য্য কেবল উদিত হইবার উপক্রম

করিতেছেন। আমার মনে হইতেছিল, যে আমাদের দেশের অবস্থাও এখন এইরূপ, কিন্তু ক্রমে সূর্য্য যখন সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে তখন দেশ যে কি গৌরবের দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া উঠিবে,—মনে মনে কল্পনা করিয়া আমার সমস্ত মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একবার সম্মুখে প্রসারিত দিগন্তবিস্তৃত গুল্ম-লতা শালতরু আচ্ছাদিত মাঠের দিকে চাহিয়া মাতৃভূমির শস্যশ্যামলা মুর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম, আর ধরিত্রীকে "মা" বলিয়া প্রাণের কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম। •মনে মনে তাঁহাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া একান্ত ভক্তির সহিত প্রণাম করিলাম !

তুমি বোধ হয় আমার এ ছাইভস্ম পাগলামী পড়িয়া হাসিতেছ। ছয় মাসের পর তোমার সঙ্গে এই সম্ভাষণ ! এই ছয়মাসে কতদিন কত কথা তোমাকে বলিব বলিয়া মনে মনে গুছাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই জানালার কাছে বসিয়া তেমনি করিয়া গল্প করিবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। আমার অভ্যাস তুমি জানই, পত্র লিখিতে আমার এত আলস্য যে দু'মাস ছয়মাস কলম ধরাই হয় না, কিন্তু একবার কলম হাতে করিলে সে কলম আর থামিতে চায় না। আমি তোমাকে যখন যে দিনের কথা লিখিতেছি, তখন সেই দিনের চিত্রটী আমার মনের ভিতর এমন উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে যেন আজই এই ঘটনাটী ঘটিয়াছে। বারান্দার এ পাশে আসিয়া দেখি উনি ঊষাকে নিয়া বাহিরে আসিতেছেন। ঊষার ছোট হাতে এক গাছি রাখী বাঁধিয়া দিয়াছেন ; আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "এস, এস, একটী ছোট্ট

স্বদেশী মানুষ দেখে যাও।" দিদিমাও সেই সময় ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখনও দিদিমার স্নান হয় নাই, কাজেই সে সময় আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ ছিল না। দিদিমাকে দেখিয়া ঊষা ছুটিয়া তাঁহার কাছে গেল। দিদিমা তাহাকে কোলে করিয়াই বলিলেন "এ কি, খুকীর যে গা গরম হয়েছে!" দিদিমা এ সমস্ত এত ভাল বুঝিতে পারিতেন যে ডাক্তার কবিরাজেরাও তাঁহার নিকট হার মানিত। "গা গরম হয়েছে" শুনিয়া উনি আসিয়া ঊষার হাত দেখিয়া বলিলেন "তাইতো, জ্বরই তো হয়েছে।" সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটী কুষ্ঠরোগী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সে বোধ হয় ডাকাডাকি করিয়াছিল, কেহ শুনিতে পায় নাই, তাই সে আস্তে আস্তে ফটক পার হইয়া ফুলবাগানের ভিতর আসিয়া তাহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা করুণ স্বরে সবে মাত্র "এ মাইজী" বলিয়া সুর ধরিয়াছে, আর উনি এমন রাগিয়া ও চিৎকার করিয়া, "যাও, যাও, আবি বাহার যাও" বলিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন যে, আমি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমি উঁহাকে এত রাগ করিতে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তারী বুদ্ধির সাবধানতার জন্য কুষ্ঠরোগী বাড়ীর ভিতর আসিলে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তাহাদের উপর খুব মায়াও ছিল। আমার মনটা বড়ই ম্লান হইয়া গেল। আজিকার দিনে,—যে দিন ভাই ভাই বলিয়া সকলকে মিলনবন্ধনে বাঁধিব সেই দিনে, এমন সুন্দর প্রভাতে ও বেচারীকে অমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া আমার কিছুতেই ভাল লাগিল না। কেন, ওকি আমাদের ভাই নয়? আমি একটু ভয়ে ভয়ে

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। তখন আস্তে আস্তে বলিলাম "ওকে দুটী চাল দিয়ে আসুক, বেচারী!" এইটুকু বলিতেই দিদিমা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "হাঁ, চাল দিয়ে আসুক! তোমাদের যেমন হয়েছে, কিছুই মান্‌বিচ নেই। সকাল বেলায়,—বাসীকাপড়ে, না নাওয়া না ধোওয়া—এখুনি ভিক্ষে দিয়ে আসুক। মা লক্ষ্মী এত অনাচার সইতে পারেন না। আর মেয়েটার জ্বর হয়েছে সে দিকে একটু নজর নেই। বাড়ীতে অসুখ হলে কি ভিক্ষে দিতে আছে?" আমি চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুটীকতক পয়সা নিয়া আসিলাম। দিদিমার নজর সব দিকেই পড়ে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এ সময় কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া আমার চুরী ধরিতে পারিলেন না। তখন আস্তে আস্তে রান্নাঘরে আসিয়া পাঁড়েকে বলিলাম "পাঁড়ে, সেই ভিখারীকে পয়সা দিয়ে এস তো।" কিন্তু সে ধমক খাইয়া তখনই চলিয়া গিয়াছে, পাঁড়ে আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

আমি ফিরিয়া আসিলে স্বামী বলিলেন "ঊষাকে দেখ গিয়া, সে যেন আজ ঘরের বাহিরে না যায়।" বলিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। আবার একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "বৈদ্যনাথে কি ডাক্তার আন্‌তে লোক পাঠাবো?" সিধু আমাদের ঘর শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে ঊষার একটু কিছু অসুখ হইলেই উনি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি বলিলাম "কেবল একটু গা গরম হয়েছে, সে জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? নিজেই তো একটা ওষুধ দিতে পার।" আমার কথায় তিনি

কোন উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না।

সে দিন বাড়ীতে রন্ধনের ব্যাপার ছিল না, সেজন্য সকলেরই এক রকম ছুটী। আমি ঘরের ভিতর বসিয়া উষার সঙ্গে খেলা করিয়া তাহাকে একটু খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িল দেখিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া তাহার মাথার নিকটে জানালার পাশে আসিয়া বসিলাম। পথ দিয়া একদল স্বদেশী সঙ্কীর্ত্তন যাইতেছিল, "বন্দেমাতরং" ধ্বনি শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। দিদিমা অন্য দিন স্নানের পরে আর আমাদের ঘরে আসেন না, আজ পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া মালা হাতে করিয়া ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "খুকী কেমন আছে।" আমি খুকীর মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বর কিছু বাড়িয়াছে। অন্য লোকের বেলায় "বাড়াবাড়ি" বলি আর যাহাই বলি, আমার নিজের মনটাও অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, বৈদ্যনাথ হইতে ডাক্তার আনিতে বলিলেই ভাল হইত।

দিদিমা ঘরের মেঝেয় বসিলেন দেখিয়া আমিও খাট হইতে নামিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলাম, তিনি বলিলেন, "না, না, থাক তুমি, খুকীর কাছেই থাক।" তারপর দিদিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সকাল বেলার সেই কুষ্ঠরোগীকে কিছু ভিক্ষা দিয়েছিলে কি?" আমি বলিলাম "না

সে চলে গিয়েছিল।” দিদিমা বলিলেন “আজ আমি পূজার সময় ধ্যান কর্‌তে বসে যতই ঠাকুরের মূর্ত্তি ধ্যান করে মনে মনে তাঁকে পঞ্চব্যাঞ্জন অন্ন ভোগ দিতে চাই, কেবলই দেখ্‌তে পাই, কতকগুলি আতুর অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী সারি সারি পাত নিয়ে বসেছে, তাদের পাতেই আমি অন্ন দিচ্ছি। তখনই মনে হ’ল গুরুদেব বলেছিলেন, ভগবানের যদি সেবা কর্‌তে চাও তবে সর্ব্বভূতের সেবা কর! সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়েই ভগবান তাঁর পূজা নেবেন।” বলিতে বলিতে দিদিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, দিদিমার কথাগুলি কেবলই মনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল, আর ভাবিতেছিলাম “ভগবান আমার দুয়ারে পূজা লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি!”

বেলা অনেক হইয়া গেল, তখনও আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন না। তাঁহার চিরকালই এইরূপ অভ্যাস, যখন যে কাজে যান, তখন তাহাতেই মাতিয়া যান, সে সময় আর অন্য কিছুই মনে থাকে না, বিশেষতঃ দেশের সম্বন্ধে কিছু হইলে তো কথাই নাই। এ দিকে খুকীর জ্বর খুবই বাড়িয়াছে, তাহার চোখ দুটী ভয়ানক লাল হইয়াছে, আর একেবারে অজ্ঞান হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। আমার মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। পাঁড়েজী, রামশরণ এবং দাই সকলকেই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ক্রমে ক্রমে পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাড়ী আসিলেন, আসিয়াই প্রথমে উষা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার

জন্য খাবার নিয়া আসিলাম, কিন্তু তিনি ততক্ষণে খুকীর কাছে চলিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় হইতে উষা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল, কোন-মতে বিছানায় থাকিতে চাহে না। জ্বরের উত্তাপে তাহার মুখখানি সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যে কি অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। আমি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাক্তার কি আনিতে পাঠাইয়াছ ?" তিনি কেবল বলিলেন "হাঁ" তাহার পর এক মনে খুকীর মাথায় বরফ দিতে লাগিলেন। আর একবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এখানকার ডাক্তার শিমূলতলাতে গিয়াছেন, বৈদ্যনাথে ডাক্তারের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি।"

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, ডাক্তার তখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না। উষা সেইরূপ ক্রমাগতঃ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, দিদিমা ঘরের এক পাশে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, আর পাঁচমিনিট অন্তর এক একবার উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন 'জ্বর কি একটু কমিল ?" আমার মনে হইতেছিল, যেন অন্ধকার রাত্রে একাকী অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছি। এক এক বার ভাবিতেছিলাম "কেন মধুপুরে এলাম ?" এই সময় বাহির হইতে "বাবু বাবু !" আহ্বান শুনিয়া "ডাক্তার আসিয়াছেন ?" বলিয়া উনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিলেন। দুয়ার খুলিতেই দেখিলাম আমাদের পাশের বাড়ীর গিন্নি আসিয়াছেন। তিনি আমার স্বামীকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন "বাবা, একবার শীঘ্র এস, বুঝি বিদেশে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। অতুল দু'বার

ভেদ হয়ে কেমন হ'য়ে পড়েছে।" গিন্নি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হইতেন না, কিন্তু আজ বিপদের দিনে আর তাঁহার লজ্জা নাই।

আমার স্বামী খাটের নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "যাই?" আমি মনের সমস্ত বল একত্র করিয়া বলিলাম, "যাও।"

সে যে কি ভয়ানক রাত্রি, তাহা আমি নিজেই মনে মনে ধারণা করিতে পারি না, অন্যকে কেমন করিয়া বুঝাইব! ঘর নিস্তব্ধ, একপার্শ্বে বসিয়া দিদিমা মালা হাতে ঢুলিতেছেন, দাই দুয়ারের নিকটে দেয়ালে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে, আর কেবল ঘড়ির "টিক্ টিক্" শব্দ সেই নিস্তব্ধতাকে দ্বিগুণ নিস্তব্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঊষা একটু শান্ত হইয়াছে, তাহার গায়ের উত্তাপও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি ভাবিলাম, জ্বর কমিয়া আসিতেছে, তাহাতেই সে একটু আরাম পাইয়াছে। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে শুনিতে আমি কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। খুব অল্পক্ষণ,—পনের মিনিট সময়ের অধিক ঘুমাই নাই, ঊষার গায়ের উপরেই আমার হাত ছিল, জাগিয়াই দেখিলাম গা অতিশয় ঠাণ্ডা, বরফের মত ঠাণ্ডা! ওঃ! মা হইয়া যে আমি কি করিয়া লিখিতেছি, জানি না।

দুয়ারে ধাক্কা পড়াতে দাই উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিল। আমার স্বামী ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "ডাক্তার আসিয়াছেন।" কিন্তু তখন আমার, কি যে হইয়াছে, কি যে হইতেছে, কি যে হইবে,—কিছুই অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল

এইমাত্র মনে আছে যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "অতুল বাবু কেমন আছেন ?" আর "ভাল আছেন" এই উত্তরটী মাত্র শুনিয়াছিলাম।

*   *   *   *

৬

পরদিন, সেই শয়ন গৃহেই, সেই খাটের উপর শুইয়াছিলাম, আজ আমার কোলের কাছে কেহই নাই। মাথার কাছে গোলাপ ফুলের গাছে কত গোলাপ ফুটিয়াছে, জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন ঊষার সেই কচিমুখের হাসি চুরি করিয়া স্বর্গের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। কাল,—ঊষা এমনি সকাল বেলায় এই খাটের উপর বসিয়া পুতুল নিয়া খেলা করিয়াছিল। আজ আমার ঊষা কই ? সেই হাসিমাখা, দুষ্টামী ভরা বড় বড় চোখ, সেই গোলাপী গাল দুখানি, সেই রাঙ্গা ঠোঁট, সেই ছোট কচি হাত দু'খানি,—কোথায় গেল ? আর আমি সেই হাসিমাখা মুখ দেখিতে পাইব না, সে আর আমাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে না—একি বিশ্বাস হয় ?

স্মৃতি-চিহ্ন।

১

দারুণ ম্যালরিয়া রোগে যখন কাত্যায়নীর শ্বশুর, দেবর, স্বামী ও পুত্রকন্যা সকলেই একে একে ভবসংসারের বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিষয় সম্পত্তিও সেই সঙ্গে পরহস্তগত হইয়া পড়িল, তখন একমাত্র শিশুপুত্র নরেশ ও পর-প্রত্যাশা ভিন্ন আর তাঁহার কোনই সম্বল রহিল না। রঘুপুরের মিত্রবংশ চিরদিন বিদ্যাগৌরবের জন্য বিখ্যাত; নরেশের পিতা ও পিতামহ উভয়েই দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সেই বংশের একমাত্র বংশধর নরেশ যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, একথা মনে করিতেও কাত্যায়নীর কষ্টবোধ হইত, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া তিনি কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না।

রঘুপুরের জমীদার চৌধুরী মহাশয়কে সকলে অতি সদাশয় বলিত, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটু কোপন স্বভাব বলিয়াও তাঁহার একটা অখ্যাতি ছিল। কাত্যায়নী মনে করিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের একটু কৃপাদৃষ্টি হইলেই নরেশ 'মানুষ' হইতে পারে। কিন্তু জমীদার মহাশয় দশ পনেরো বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপাতে স্বগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় গিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন; বৎসরের মধ্যে একবার পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিতেন। তাঁহার ভদ্রাসনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তিন দিন গ্রামের কাহাকেও অভুক্ত থাকিতে হইত না। সেবার অষ্টমীর

রাত্রে সন্ধিপূজা শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা যখন দেবী প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন, ঠিক সেই সময়টিতে কাত্যায়নী জমীদার গৃহিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৌ, আজ মায়ের সমুখে আমাকে একটি ভিক্ষা দাও, তোমার অক্ষয় পুণ্য লাভ হবে।" জমিদার পত্নী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "কি ভিক্ষা, ঠাকুরঝি?" কাত্যায়নী ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে তাঁহার কোলের কাছে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "আমার নরুকে তোমার হাতে দিলাম, ছেলে যা'তে মূর্খ না হয় তোমাকে তাই কর্‌তে হবে।" জমীদার-পত্নী দুখিনী বিধবার এই কাতর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় নরেশকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কলিকাতায় গিয়া নরেশ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, কি কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, তবে একথা সকলেই জানিল যে নরেশ যখন প্রবেশিকা-সাগর সন্তরণে পার হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিল তখন রায়গঞ্জের রমানাথ বসু স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা দানে সমুৎসুক হইলেন; নরেশকে দেখিয়া তাঁহার এতই মনে ধরিয়াছিল যে, গরীবের ঘর বলিয়া অধিকাংশ আত্মীয় আপত্তি করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

'রায়গঞ্জের রমানাথ বসু' এই নামটা সে অঞ্চলে কে না জানিত? বসুজা মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ, কিন্তু তাঁহার পিতৃনামে মধ্যম পঞ্চ-সন্তানের মধ্যে হেমাঙ্গিনী তাঁহার একমাত্র কন্যা ও শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া অত্যন্ত আদরনীয়া। তিনি সর্ব্বদা

বলিতেন "মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনি আমি নারায়ণ এনে জামাই করবো।" এই জন্য, নরেশচন্দ্র তাঁহার মনোনীত হইলে তিনি আর কাহারও কথা না শুনিয়া তাহাকে কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কেহ কথা প্রসঙ্গে নরেশের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "যে মানুষ হয়, সে কি তার স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ কর্‌তে পারে না? আমি মানুষ চাই, ধন সম্পত্তি থাক্ না থাক্, তা দেখ্‌তে চাই না।"

নরেশের শ্যালকেরা কিন্তু বুঝিলেন, পিতা মুখে যাহাই বলুন না কেন, কার্য্যতঃ তাঁহাদের সম্পত্তির এক অংশ নিশ্চয়ই হেমকে উইল করিয়া দিয়া যাইবেন। ভাই বিষয়ের ভাগ পায় এ ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সে এক রকম সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বোন বিষয়ের ভাগ পাইলে তাহা সহজে সহ্য হয় না। বসু মহাশয় বুদ্ধিমান হইয়াও বুঝিতে পারিলেন না, যে এই বিবাহের ফলে হেম তাহার ভ্রাতাদের বিদ্বেষের পাত্রী হইয়া দাড়াইল।

বিবাহের পর গোলমাল চুকিয়া গেলে নরেশ আবার কলিকাতায় গিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্ব্বের মত থাকিয়া পড়া শুনা করিবে, মাতা পুত্রে ইহাই স্থির করিলেন। দশটাকা বৃত্তিতে পড়িবার খরচ চলিবে না, বিশেষ এতদিন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া আজ বড়মানুষের জামাই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াটা কোন মতেই সঙ্গত নহে। কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ব্বে শ্বশুরের সহিত দেখা করিতে গেলে বসু মহাশয় জানিতে চাহিলেন যে, সে এখন কোথায় থাকিয়া পড়া শুনা করিবে।

নরেশ যাহা স্থির করিয়াছিল তাহা জানাইলে তিনি বলিলেন "কেন বাবা, ওখানে যদি তোমার পড়াশুনার অসুবিধা হয়, তবে এবার পৃথক বাসা করেই পড় না কেন, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয় সে ভার না হয় আমার উপর থাক্‌বে" বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন তিনি নরেশের পড়িবার খরচ দিবেন। নরেশ সবিনয়ে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল "সেখানে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না।"—রমানাথ বাবু মুগ্ধ হইলেন। তিনি যে আদর্শ খুঁজিয়া আসিয়াছেন, নিজের ছেলের নিকট যাহা পান নাই, আজ পরের ছেলের নিকট তাহা পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এই তরুণ সৌম্য মূর্ত্তি বালকটীর অন্তরের প্রকৃত পরিচয় যেন সেই সবিনয় আপত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইল। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "তাই ভাল বাবা, সেইখানেই তুমি থাক, আমি না বুঝে অন্যত্র থাক্‌তে বলেছিলাম। তাঁরা তোমাকে এত দিন প্রতিপালন করেছেন—যে ভাবেই করুন,—তবুও তাঁদের ঋণ তুমি কখনও শোধ দিতে পার্‌বে না, আর আমিও তাঁদের কাছে—চিরঋণী, যে, তাঁদের দয়াতেই তোমাকে পেয়েছি।"

নরেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার সম্বন্ধে বাড়ীর আর সকলেরই কিছু না কিছু ভাব ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তণ হইয়াছে, কেবল পরিবর্ত্তন হয় নাই, কমলের। কমল, চৌধুরী মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা, তাহার বয়স দশ বৎসর।

নরেশ বাড়ীর ভিতর যাইবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী সস্নেহহাস্যে বলিলেন, "এই যে বড় মানুষের জামাই! কখন এলে।" নরেশ তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "এই

ভোরের গাড়ীতে।" "থাক্ বাবা থাক্, প্রাতঃবাক্যে চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাক। মা যেমন দুঃখ করে মানুষ করেছে, সে দুঃখ তার সার্থক হোক্। আর আমরা ও বাবা, ফণী আর তোমাকে তো কখনও ভিন্ন ভাবিনি। তোমার মা যে দিন আমার হাতে সঁপে দিলে, সেদিন থেকে পেটের ছেলের মতই যখন যা করা দরকার তাই করে আস্‌ছি।

গৃহিণীর এইরূপ বক্তৃতা আরও বহুক্ষণ চলিত, কিন্তু হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে ও তালে তালে দ্রুত দুপ্ দুপ্ শব্দে পদধ্বনি করিতে করিতে কমল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে নরেশের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল "নরেশ দাদা, নরেশ দাদা, বিয়ে করে এলে, তার বৌ কই? বৌ কি শেয়ালকে দিয়ে এসেছ নাকি? শেয়াল বল্‌ছে "টোপরের বদলে বৌ পেলাম, টাক্‌ডুমাডুম ডুম্!"

এক মুহূর্ত্তেই ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। ঘরের ভিতর যেন একটা সৌরভ মিশ্রিত আনন্দের দম্‌কা বাতাস বহিয়া গেল; গৃহিণী রাগ করিয়া বকিয়া উঠিলেন "দেখ না, মেয়ে যেন দিনে দিনে ধিঙ্গী হচ্ছেন!" কিন্তু তিনি যতই বকুন, তাঁহার এই দুরন্ত মেয়েটাকে তিনি কোন মতে সাম্‌লাইতে পারিতেন না।

গৃহিণীর বকুনির অবসরে নরেশ চুপি চুপি কমলকে বলিল "বৌ আছে রে, শেয়ালে নেয় নি; নিয়ে আস্‌ব এর পর, দেখিস্।" কিন্তু বলিয়াই আবার ভয় হইল, কমল পাছে আব্‌দার ধরিয়া বসে "এখনি নিয়ে এস।"

এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি কমলের সঙ্গে নরেশের গাঢ় বন্ধুত্ব

হইয়াছিল, কমল তখন চার বৎসরের। কমলের সঙ্গে বন্ধুত্বরক্ষা নিতান্ত সহজ নয়, তাহার যেমন সকলের সঙ্গেই অতি শীঘ্র বন্ধুত্ব হইত তেম্‌নি একটুতেই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিত। একমাত্র নরেশই কেবল ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কমলের সকল আব্‌দার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়াছিল। যথার্থ কথা বলিতে কি, এক হিসাবে কমলের জন্যই নরেশ এতদিন এ বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে, নহিলে পরের ঝঞ্ঝাট এমন ভাবে দীর্ঘকাল ঘাড়ে রাখিতে গৃহিণী বোধ হয় স্বীকৃত হইতেন না।

যাহাহউক, কথাবার্ত্তা শেষ হইলে নরেশ বলিল, "জ্যাঠাইমা, তবে বাজারের পয়সাটা দিন, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "থাক্ বাবা, তোমার আর বাজারে যেয়ে কাজ নেই, মাধবই যাবে। সকাল বেলা তোমার পড়ার বড় ক্ষেতি হয়। তবে কি জান, চাকর বাকরের বাজার করা, ওরা তো কেবল অর্দ্ধেক চুরি কর্‌বে বইতো নয়, আর তুমি যেমন আপনার মনে বুঝে জিনিস পত্র আন,—"

নরেশ তাঁহার কথা শেষ হইবার অবসর না দিয়া বলিল "না একবার বাজারে ঘুরে আস্‌বো তাতে পড়ার আর কি ক্ষতি হবে? বেলা হয়ে গেলে আর ভাল মাছ পাওয়া যাবে না জ্যাঠাইমা, আপনি আর দেরী কর্‌বেন না।"

"পড়ার ক্ষতি হবে" গৃহিণীর মুখে এ কথা যে নরেশ প্রথম শুনিল তাহা নহে, আগেও অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার সুর অন্য রকম ছিল। সন্ধ্যার সময় লণ্ঠন পরিষ্কার করা হয় নাই, অঙ্ক কসিতে কসিতে নরেশ সে কথা হয় তো ভুলিয়া গিয়াছে,

যতক্ষণ আলো দেখা যায় নরেশ ছাদে বসিয়া ততক্ষণ একমনে অঙ্ক কসিয়াছে, কিন্তু যখন আর চোখে দেখা যায় না, তখনই নরেশের ছাঁৎ করিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে "ওঃ আজ যে আলো সাজানো হয় নাই।" তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত নীচে নামিয়া আসিয়া লণ্ঠনে হাত দিবামাত্র গৃহিণী তখনই বলিয়াছেন, "থাক্ থাক্, তোমার পড়ার ক্ষেতি হবে, আমিই লণ্ঠন সাজাচ্ছি। চাকররা পারে না, নষ্ট করে ফেলে, তুমি পার তাই, নহিলে কি আর সাধ করে বলি? সন্ধ্যা উৎরে গেল, এখন এলেন আলো সাজাতে।"

হয় তো কোন দিন ছোট খোকা আব্দার লইয়াছে, গৃহিণী রাগিয়া তাহার পিঠে ভাদ্রমাসের কিল বর্ষণ করিতেছেন, নরেশ খোকার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া গেলেই বলিয়াছেন "থাক্, থাক্, তুমি কেন আবার এসেছ? যাও, তোমার আর ছেলে ধরতে হবে না, তোমার পড়ার ক্ষতি হবে।

(৩)

এটা গেল নরেশের জীবনের কেবল এক অংশের ইতিহাস, কিন্তু তাহার জীবনের আর একটী অংশ ছিল, যাহার ইতিহাস কেবল তাহার নিজের মনের মধ্যেই লেখা ছিল, অন্যের চক্ষে সে ইতিহাস কখনও পড়ে নাই। সে ইতিহাস কেবল স্বপ্নের ইতিহাস, অথবা জাগরণ ও স্বপ্নে মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব অনুভূতির ইতিহাস। অতি শৈশবে ছোট কাকা কোন্‌দিন তাহাকে আদর করিয়া রাসের মেলা হইতে একটী লাঠিম কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন সে কথাটীও সে ইতিহাসের এক কোণে লিখিত আছে। যে

চিত্রপট।

টিয়া পাখীটা খাঁচায় থাকিয়া কেবল ক্যা ক্যা করিয়া চেঁচাইত, তাহার স্মৃতির সহিত মা দুপুর বেলায় বসিয়া তাহাকে ধারাপাত পড়াইতে পড়াইতে যে তাহার ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিতেন সে কথার কোন বিশেষ মিল না থাকিলেও হয় তো টিয়ার কথার সঙ্গেই মার কাপড় সেলাইয়ের কথা একত্রে সংযুক্ত হইয়া মনে পড়িত, আবার হয়তো সেই সঙ্গে পদ্মবিলের ধারে যে একটা গাবগাছে মস্ত বড় মৌচাক হইয়াছিল, আর মৌচাক ভাঙ্গিয়া লইবার পর মাছিরা যে আট দশ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত সেই শূন্য গাব গাছের ডালের চারি পাশে গুণ গুণ করিয়া ঘুরিয়াছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িয়া যাইত। বস্তুতঃ হয়তো এই সকল ইতিহাসের মধ্যে এমন একটী নিগূঢ় সংযোগ সূত্র ছিল, যাহাতে বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন স্মৃতিগুলি মাল্যের মত গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু কি সে সূত্র,—দিনে, দিনে, পলে, পলে, ঘটনার প্রতিকুলতা ও অনুকুলতার তরঙ্গে খণ্ডিত মানব জীবন যাহাকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ড ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে? দার্শনিক বলেন, কবি বলেন, সে সূত্র ভালবাসা; আর অন্য কিছুতেই বহুকে এমন করিয়া এক করিতে পারে না। নরেশের সমস্ত বাল্য জীবনের স্মৃতি ও একই সূত্রে গ্রথিত ছিল, সে সূত্র জননীর স্নেহ। আপনাকে বাদ দিয়া লোকে যেমন স্বপ্ন দেখিতে পারে না, সকল স্বপ্নের মধ্যে যেমন "অহং" এর অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকেই, নরেশের জীবনের সকল স্বপ্নের মধ্যে সেইরূপ মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জননীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর কুলপ্লাবিনী স্নেহের বন্যায় তাহার জীবন সংগ্রামের কঠোরতার সকল

ব্যথা ভাসিয়া যাইত! লোকে দেখিত নরেশের বড় দুঃখ, কিন্তু নরেশ আপনার আনন্দে আপনি ভরপূর থাকিত।

হেমের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিলে কর্ণে'র সম্বন্ধে প্রথমেই তাই তাহার মনে হইয়াছিল, "আহা, বেচারীর মা নাই!" বারো বছরের মেয়ে এখনকার দিনে যেমন চালাক চতুর হইয়া উঠে, হেম তাহা হয় নাই। বেশভূষা করা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। হেমের দুই বৌদিদি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন; যিনি বাড়ীতে থাকিতেন, তিনি চুলের পারিপাট্য, নভেল, পশমের শিল্প ও দিবানিদ্রা লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, নিজের সন্তানদেরই খোঁজ লইবার অবকাশ পাইতেন না, ননদের খোঁজ লওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অযত্ন-মলিনা হেমকে যেন আরও সুন্দর দেখাইত,—অন্ততঃ নরেশের তাহাই মনে হইয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় চকিত নেত্রে হেমের মুখখানি দেখিয়া নরেশ ভাবিয়াছিল, "এ যেন ঠিক র‍্যাফেলের আঁকা একখানি ম্যাডোনার ছবি।" কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে হেমকে দেখিল, তখন তাহার মনে হইল, "ছবিতে কখনও এত সৌন্দর্য্য ও এত কোমলতা প্রস্ফুটিত হ'তে পারে না।"

নরেশের বিবাহের পর অনেকে বলিয়াছিলেন, "ছোক্‌রা বেশ পড়াশুনা কর্‌ছিল, কিন্তু বিয়ে করে এবার মাটী হয়ে যাবে।" কিন্তু কার্য্যতঃ হিতৈষীদের শুভ কামনা ফলবতী হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিবাহের পর নরেশের পাঠের উৎসাহ বাড়িল বই কমিল না। এল্‌ এ পরীক্ষা দিবার পর সে যে নিশ্চয়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে, সে বিষয়ে তাহার সহাধ্যায়ী অথবা অধ্যাপকগণের কোন সন্দেহ রহিল না।

চিত্রপট।

নরেশ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গেল। মা বলিলেন, "বাবা এবার তো তোর পরীক্ষা হয়ে গেল, এখন রায়গঞ্জে গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আয়। আমি আর কতদিন এ শূন্য ঘরে একা থাক্‌বো বল্‌ দেখি?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "আমি তো এখন তোমার কাছে বসে আছি মা, তবুও তোমার একলার দুঃখ আর যাচ্ছে না?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি কি বাবা, আমার কাছে থাক? তুই যখন বিদেশে থাক্‌বি, শাশুড়ী বৌ সুখ দুঃখের সাথী, তোর কথা মনে ক'রে দু'জনে দিন কাটাবো। তোকে দূরে রেখে একলা যে প্রাণ কি করে, তুই তার কি বুঝবি, বাবা?"

মা যখন এ কথা বলিতেছিলেন, নিয়তি তখন যে কি নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিল, তিনি তাহা জানিতেন না।

নরেশ মিনতি করিয়া বলিল, "তোমার কাছে দু'দিন থাকি মা, তার পর না হয় রায়গঞ্জে যাব। সেখানে গেলেও হয় তো আবার ফিরে আস্‌তে দিনকতক দেরী হবে। তোমার কাছ ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না, মা!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লা! কবে যে তোর বুদ্ধি হবে?"

ইহার প্রায় দুইমাস পরে চৌধুরী মহাশয় একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মফঃস্বলস্তম্ভে একটী সংবাদ পড়িয়া চমকিত হইলেন। সংবাদটী এই—"গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় রায়গঞ্জের জমীদার রমানাথ বসু মহাশয় হৃদ্‌রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহার একমাত্র জামাতার বিসূচিকায় মৃত্যু হয়। বসু মহাশয় জামাতার মৃত্যুসংবাদ

শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। বসু মহাশয়ের তুল্য মহাপ্রাণ, সদাশয় ও দীনবৎসল জমীদার এ অঞ্চলে আর আছেন কি না সন্দেহ। ভরসা করি, সেই স্বর্গীয় মহাত্মার দৃষ্টান্তে তাঁহার পুত্রেরাও পিতৃপদানুসরণ করিবেন। বসু মহাশয়ের জামাতা নরেশচন্দ্রও অতি সচ্চরিত্র ও প্রতিভাবান্ যুবক ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল। কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল। জামাতার সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া বসু মহাশয় মহা-সমারোহে কালীপূজা ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিলেন। উৎসবের সমারোহ না মিটিতে মিটিতেই রায়গঞ্জ অন্ধকার হইয়া গেল। ভগবান্ এই শোকাভিভূত পরিবারকে শান্তিদান করুন।"

চৌধুরী মহাশয় সংবাদ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আল্‌বোলার নল ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো শোন, শোন, কি সর্ব্বনাশের কথা!"

"কি সর্ব্বনাশ আবার হল তোমার?"

"নরেশ যে মারা গিয়েছে।"

"নরেশ? কি বল গো? আমাদের নরেশ? সে যে কালীপূজায় শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল? খবর পেলে কার কাছে? কি হয়েছিল তার?"

এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী মহাশয় কেবল বলিলেন, "কলেরা হয়েছিল।" অশ্রুর আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া

গিয়াছিল। "চুপ কর, চুপ কর, এ কথা নিয়ে আর তোলাপাড়া করো না। কমল শুন্‌লে এখনি কেঁদে কেটে অনথ করবে। আহা মাগী কত কষ্টেই ছেলে মানুষ করেছিল, সবই কপাল!"

৪

তখন খুব ভোর, পূর্ব্বদিক কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। গাছ, পাতা, ঘাস সমস্ত শিশিরে আর্দ্র, কিন্তু কুয়াসা তেমন বেশী নাই। ছিন্ন লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমাঙ্গিনী তাহার শাশুড়ীকে ডাকিল, "মা!"

একবার আহ্বানে শাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল না।

হেমাঙ্গিনী আবার ডাকিল, "মা, ওঠ, বেলা হয়ে গেল, ডাল ধু'তে ঘাটে যাবে না? বড়ি দেওয়া হবে কখন?"

শাশুড়ীর এইবার ঘুম ভাঙ্গিল। নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এত ভোরেই উঠেছিস্ পাগলীর ঝি? বড় শীত, আয় আর একটু লেপের ভিতর শুয়ে থাক্।"

বউ বলিল, "মা যেন কি! ঘুমোলে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। দত্তদের বাড়ী থেকে যে দশ সের ডাল এনেছ বড়ি দিতে, তাকি ভুলে গিয়েছ নাকি? ধু'তে বাঁটতে কত বেলা হবে বল দেখি? বড়ি দেওয়া হবে কখন? এই বড়িগুলো তুলে দিলে পাঁচ আনা পয়সা পাওয়া যাবে, তবে আমাদের তেল নুন কেনা হবে, ঘরে একটুও যে নেই।"

বউয়ের কথা শুনিয়া শাশুড়ীর নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া হাঁই তুলিলেন, তারপর তুড়ি দিতে দিতে ও অনুচ্চস্বরে প্রাতঃস্মরণ করিতে করিতে বিছানায়

উঠিয়া বসিলেন। বউ ইতিমধ্যে দুয়ারের আগড় খুলিয়া ফেলিল; ঘরে আলো দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তাইত, সকাল হ'য়ে গিয়েছে যে!"

দুইধারে ঝোপ ও আগাছার বন, তাহার ভিতর দিয়া নদীর পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুইজনে ডালের ধামা লইয়া সেই পথে চলিলেন। তখন দুই একজন লোক উঠিয়াছে। মাঠে খেজুরগাছ হইতে রস পাড়িবার জন্য চাষীরা কেহ গাছের উপর উঠিয়াছে, কেহবা ভাঁড় হাতে নীচে দাঁড়াইয়া আছে। নরেশের মা অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতে-ছিলেন, হেমাঙ্গিনী বেলা হইবার আশঙ্কায় আগেই চলিয়াছে; এমন সময় "ওগো, মাগো!" এই চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

চীৎকার শুনিয়া নরেশের মা, "ওগো দেখ, কি হোল" বলিয়া ছুটিয়া গেলেন, মাঠে যাহারা ছিল, তাহারাও দৌড়িয়া গেল। একটু গিয়াই সকলে দেখিতে পাইল, ঘাটের উপর হেমাঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ধামার ডাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বধূকে এই অবস্থায় দেখিয়া শাশুড়ী ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আঃ অভাগীর ঝি! তোর কপালে এত দুঃখ ছিল? এত লোক মরে, তোর কেন মরণ হয় না, তা হলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই! দেশে কি মানুষ নেই রে, নিত্যি নিত্যি এই রকম অত্যাচার? গরীবের উপর এত অত্যাচার ধর্ম্মে সইবে না।"

৫

"দিদি, শুনেছ ? নরেশের বো আজ ভোরে ঘাটে ডাল ধু'তে গিয়েছিল, আর বাঁশবন থেকে কে নাকি বেরিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরেছিল। বৌটা ভয় পেয়ে "আঁাউ মাউ" করে তখনি ঘাটের উপর ভিরমী গিয়ে পড়েছিল। ওদের হ'ল কি দিদি ? সে দিন নাকি রাতে চাল কেটে কে মট্‌কা ব'য়ে ঘরে নেমেছিল, পড়বি তো পড় একেবারে গিয়ে ধানের ডোলের উপর। আবার রোজ সন্ধ্যার পর নাকি ওদের বাড়ীর উঠানে ঢিল গোহাড় এই সব পড়ে, কিন্তু জন-মনিষ্যি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হল কি দিদি ? বৌটাকে ভূতে টুতে পায় নি তো ?"

"তুইও যেমন ক্ষেপী, তাই ওই সব কথা শুনিস্‌। নরেশের বৌর রীত চরিত্তির সবই তো জানিস্‌, তবে আবার ন্যাকা সাজিস্‌ কেন ? বৌটা যেন মিট্‌মিটে ডা'ন, দেখ্‌তে কত শিষ্টশান্ত, এদিকে ভেতরে ভেতরে ছেলে খাবার রাক্ষস। কুমুর মুখে আমি শুনেছি, এ তো আর মিথ্যে হবার নয় ? লোক দেখানো কাঁথা সেলাই ক'রে, দড়ির শিকে ক'রে বিক্রী করা হয়। যারা নাকি শিকে ভেঙ্গে, কাট্‌না কেটে, পরের ঘরের বড়ী আমসত্ত্ব দিয়ে দিন গুজ্‌রাণ করে, তাদের ঘরে এত আতর গোলাব আসে কোত্থেকে ? কাঁথার সূতো বার করতে বেতের ঝাঁপি খুলেছিল, কুমু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। যে দিন আমি একথা শুনেছি, সেই দিনই বলেছি, ওর স্বভাব কখন ভাল নয়। তা না হলে, এত রাজ্যের লোক থাকতে যত লোক যায়, ওর বাড়ীর মট্‌কায় উঠ্‌তে, আর ওরই ঘরের বেড়া কাট্‌তে। কই কত

লোকের বৌঝি ঘাটে যাচ্ছে, কারু তো কেউ হাত চেপে ধরে না, ওরই বা হাত চেপে ধরে কেন ?"

"সত্যি দিদি তাও বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু দিদি, বৌটীকে দেখ্‌লে তো মন্দ বলে মনে হয় না, আহা মুখখানি যেন দিনরাত মলিন করেই আছে।"

"ও সব ঢং লো ঢং! শাশুড়ী মাগী আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গাল দেয়। আমি যেন আর বুঝ্‌তে পারিনে যে, আমাকেই বল্‌ছে। ভুবো আমার সুবোধ ছেলে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কেউ কোন দিন তার উঁচু নজরটী দেখেনি। আমার সেই ছেলের উপর ঠেস্‌ দিয়ে কথা বলে। আবার বলে, "ভগবান বিচার করবেন," ভগবান যেন ওর হাত ধরা।"

"হাঁ দিদি, ভুবোর কথা আর মেজ্‌দার কথা, দু'জনের কথাই বলেছে শুনেছি। নরেশের মা নাকি একদিন তাদের ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছিল।"

"দেখেছিল দাঁড়িয়ে থাক্‌তে! বিষ্টি হচ্ছে কোথায় যাবে? ঘরের কানাচে দাঁড়ালেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! আঃ, মাগীর আস্পদ্দা দেখ একবার! চাল কেটে ওদের গাঁ থেকে বিদেয় করে দিক্ না গা! আপদ রাখা কেন?"

"কি লো কার কথা হচ্ছে?" বলিয়া বেবতি পিসি আসিয়া আসরে অবতীর্ণা হইলেন।

"মেনী বল্‌ছিল, নরেশের বৌ নাকি ঘাটের পথে ভূত দেখে ভিরমী গিয়েছিল।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পিসি বলিলেন, "ধর ধর ললিতে, আর

না পারি চলিতে!" কথা শেষের সঙ্গেই একটা হাসির রোল উঠিল।

অঘোরের মা পিছন হইতে বলিলেন, "দিদি, ওদের কথা আর বোল না, যেমন শাশুড়ী তার তেমনি বৌ হয়েছে। চৌধুরীকে বল্লেন নরেশের মা, "কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে পড়াতে হবে," কর্ত্তা অমনি তটস্থ। আর আমি যে এত পায়ে ধরে সাধ্‌লাম, "আমার অঘোরকে নিয়ে যাও," তা কই শুন্‌লে? এতেই বোঝ দিদি, আর বেশী কি বল্‌বো। বাছার আমার কোন দোষ নেই, কেবল একটু গাছে চড়্‌তে, পাখী পাড়্‌তে, আর একটু সাঁতার দিতে ভালবাসে। আর, হোলো, খেল্‌তে গিয়ে ইঁট পাট্‌কেলটা ছুঁড়লে, কদিচ কখনও যদি কারও কলসী ভাঙ্গলো তা হলে আর রক্ষে নেই। তা, কল্‌কাতায় তো আর গাছও নেই, পুখুরও নেই, কলসী নিয়ে ঘাট থেকে জল আনাও নেই। বাছার আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খেলা পেলে তো সমস্তদিন নাওয়া খাওয়া মনেই থাকে না। কর্ত্তা বল্লেন, "ওর পড়া শুনো হবে না।" পড়াশুনো হবে কেবল সেই হাড়হাবাতীর ছেলের! যেমন ছেলের বিদ্যের অহঙ্কারে চোখে দেখ্‌তে পেতেন না, তেম্‌নি হয়েছে। দর্পহারী মধুসূদন আছেন।"

রেবতি পিসি বলিলেন, "ছি! ছি! ওদের মুখ দেখ্‌লে প্রাচি-ত্তির কত্তে হয়, দত্তরা নিঘিন্নে, তাই ওদের হাতের জল খায়।"

৬

যে দিন বিকালে মুখুয্যেদের রোয়াকে এইরূপ মেয়ে মজলিস্ বসিয়াছিল, সেই দিন রাত্রে অন্ধকার ভাঙ্গা ঘরে শাশুড়ী বৌতে সুখ-

দুঃখের কথা হইতেছিল। শাশুড়ী বলিতেছিলেন, "কি করবো মা, উপায় তো ভেবে পাই না। দেশে এমন লোক নেই যে, গরীবের মুখের দিকে চায়। কেবল এক দত্তরা আছে বলে এখনও ভিটেয় আছি, না হলে কোন্ দিন ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'ত। তা দত্ত গিন্নিও তো পশ্চিমে চলে যাচ্ছে, আর কার ভরসায় দেশে থাকবো মা। এ জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, যাই কোথা ?"

হেমাঙ্গিনী কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমরা কার কি করেছি মা, কেন আমাদের উপরেই লোকে এত অত্যাচার করে ? এই গ্রামে তো কত লোক বাস কচ্ছে, আমাদেরই বা কোন্ অপরাধে লোকে ভিটে ছাড়া কত্তে চায় ? মা, এই ভিটে—" বলিতে বলিতে হেম আর বলিতে পারিল না, তাহার দুই চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে লাগিল।

"আমাদের কি অপরাধ, মা ! আমাদের অপরাধ আমরা গরীব, আমাদের অপরাধ আমরা অনাথ, আর আমাদের অপরাধ আমরা কখনও কারো মন্দ করিনি। এ অপরাধ ছাড়া আর কি অপরাধ আছে, তা জানি না ! আর এক অপরাধ—" বলিয়া কাত্যায়নী কি বলিতে গিয়া একবার বধূর দিকে চাহিয়া থামিলেন।

কিন্তু তিনি না বলিলেও হেমাঙ্গিনী তাহা বুঝিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে শান্তস্বরে বলিল, "মা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু মরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাই না। মা, মরলে হয় না ? তা হলে তো তোমায় আর দিন দিন আমাকে নিয়ে এত কষ্ট ভুগতে হয় না।"

শাশুড়ী বধূর কথায় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ছি মা, ও কথা আর মনে এনো না। আত্মঘাতী হওয়ার বাড়া আর পাপ নেই। ভগবান এত লোককে রক্ষা কর্‌ছেন, আমাদেরই কি উপায় কর্‌বেন না? দত্ত গিন্নী পশ্চিম যাচ্ছে, চল, না হয় ঘর দুয়োর বিক্রী করে ঐ সঙ্গে কাশী চলে যাই।"

হেমাঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, আমি কাশী যাব না। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেখানে গিয়েও শান্তি পাবে না। বরং তুমি দাদাকে ভাল করে একখানা চিঠি লিখে দেখ, তিনি যদি নিয়ে যান।"

শাশুড়ী মুখে বলিলেন, "হাঁ, ভাইরা সাত জন্মে খোঁজ নেয় না, সেই ভাই আবার নিয়ে যাবে।" কিন্তু মনে মনে বধূর সহিত বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়াই জগৎ শূন্যময় দেখিলেন।

৭

সকালবেলায় হেমাঙ্গিনী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব্বরাত্রে সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাই ভাবিতেছিল। স্বপ্নে সে নরেশকে দেখিয়াছিল, যেন তিনি তার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেই কাপড় জামা, সেই কপালে লম্বা চুল পড়িয়া কপালের আধখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেই হাসি হাসি চোখ, তেমনি সব। মাথায় হাত দিয়া তিনি যেন হেমের এলোথেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে কত কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কিছুই মনে পড়িতেছে না, তবু একটা সুবিমল তৃপ্তি ও সুগভীর আনন্দে তাহার হৃদয়:পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আজ যেন তার

আর কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, কলরবপূর্ণ সংসারের ভাষা আর কর্ণে স্থান পাইতেছে না, চোখে যাহা দেখিতেছে, কর্ণে যাহা শুনিতেছে, সে সমস্তই যেন নদীর স্রোতের উপরে পত্ররাশির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, শুধু কোন দূর আকাশের পূর্ণচন্দ্র নদীতরঙ্গে বিম্বিত হইয়া হিল্লোলে হিল্লোলে শত চন্দ্রের রূপ ধরিয়া খেলা করিতেছে। আজ আর তাহার নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া শঙ্কা হইতেছে না, আপনাকে দুর্ভাগিনী মনে করিয়া ক্ষোভও হইতেছে না। গত রাত্রির স্বপ্ন যেন সমস্ত জগৎকেই স্বপ্নের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আজ তাহার চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে। যে জগতে সে বাস করে, যে জগতের সঙ্গে তাহার প্রতিদিনের সম্বন্ধ, এ যেন সে জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে না।

গতরাত্রে হেমাঙ্গিনীর জ্বর হইয়াছিল, শাশুড়ী আজ তাই তাহাকে সকালে স্নান করিতে দেন নাই, ভোরে উঠিয়া বাসী পাট সারিয়া তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। ডাকহর্করা চিঠি দিতে আসিয়াছিল, হেমাঙ্গিনীকে একা দেখিয়া একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, দুই এক বার "মা ঠাকুরুণ কি বাড়ী আছেন?" বলিয়া ডাকিয়া "একখানা চিঠি আছে" বলিয়া চিঠি খানি উঠানে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্তে হেমাঙ্গিনীর মন স্বপ্নজগৎ হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল। নীচ জাতীয় ডাকহর্করার এই ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনে সে যত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, সকলই তাহার মনে পড়িয়া গিয়া তাহার

মনের অভিমানসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এতদিন সে কাহারও উপর অভিমান করে নাই। আজ এ. অভিমান কাহার উপর? বোধ হয় যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাঁহারই উপর।

হেমাঙ্গিনী পত্র কুড়াইয়া লইয়া দেখিল, তাহার দাদার পত্র। কাত্যায়নী হেমকে লইয়া যাইবার জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, এ তাহারই উত্তর।

হেমাঙ্গিনীর দাদা তাহাকে লিখিয়াছেন, "তোমার শাশুড়ীর পত্র পাইলাম। তোমার সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। যাহার জন্য বংশে কলঙ্ক পড়িয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার এখন মরণই মঙ্গল। আমরাও ভাবিব, তুমি মরিয়া গিয়াছ।"

পত্র পড়িয়া হেমের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, প্রস্তর পুত্তলিকার ন্যায় ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, অপূর্ব্ব কি লিখেছে?"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

শাশুড়ী ভীতা হইয়া বলিলেন, "সকলে ভাল আছে তো?"

৮

গৃহিণী চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "ওগো, নরেশের বৌ আর তার মা এসেছে।"

চৌধুরী মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন, "নরেশের বৌ!—কলিকাতায়? সেকি? সে কেন আমার বাড়ীতে?"

গিন্নি বলিলেন, "থাক্‌বে বলে এসেছে।"

কর্ত্তা মহা উগ্র হইয়া বলিলেন, "না, না, তা হবে না! আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। এখনি বিদেয় কর। গ্রামে কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থান নেই, আবার কল্‌কাতায় আসা হয়েছে!"

গিন্নি বলিলেন, "রাগ কর কেন? আগে সব কথা শোন।" "তুমিই শোনগে, আমার কিছু শোন্‌বার দরকার নেই।" বলিয়া কর্ত্তা চটিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী তাঁহার কন্যা কমলকে ডাকিলেন। কমলকে দেখিলে এখন আর সে কমল বলিয়া চেনা যায় না। এক বৎসর হইল কমল বিধবা হইয়াছে। মুখখানি যেন সন্ধ্যাবেলার পদ্মের মত, —তেমনি সুন্দর, তেমনি মলিন।

গৃহিণী বলিলেন, "এ যে বিষম দায় হোল মা, কি করি বল্‌ দেখি?"

কমল বলিল, "মা, ওরা দু'দিন উপোষ করে এসেছে, এইমাত্র দুটী ভাত মুখে দিয়ে শুয়েছে, এখন আর ওদের কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে যেওনা। বাবা যদি বকেন, সব দোষ আমি ঘাড়ে নেব।"

"ওঁর রাগ তো জানিস্‌, হয়তো বল্‌বেন, দারোয়ান দিয়ে বার করে দাও। দেখি একবার ঘুমিয়েছে কি না?" বলিয়া গৃহিণী, নরেশের মা বধূকে লইয়া যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে গেলেন।

তিন রাত্রি জাগরণের পর হেম আজ নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কমল মায়ের পিছনে পিছনে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া হেমের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চিন্তাবিবর্ণ ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিল, "হে ভগবান্‌, এ ঘুম যদি আর না ভাঙ্গ্‌তো!" গৃহিণীর চিন্তার

গতি কিন্তু অন্যদিকে ছিল, সচকিতা গৃহিণী বলিলেন, "ওলো কমল, ত্থাখ্‌তো মা, এ আবার কি ? ওমা, এ যে কাগজের বাক্সে করা খোস্‌বোর শিশি ! লোকে যা বলে তা তবে মিথ্যে নয় ? ছুঁড়ির গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি ঘুমে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, আর দেখি কি না বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকোনো ছোট একটা কাগজের বাক্স। দেখে আমার হাত পা কাঁপ্‌ছিল, মা, কি জানি কার কি চুরি করেই বা এনেছে। বাইরে গিয়ে বাক্স খুলে দেখি কিনা, তুটো শিশি ! আমি ছুঁড়িকে দেখে ভেবেছিলাম, বুঝি ভাল, এসেছে, থাক্ এখানে। কর্ত্তাকে বলে কয়ে না হয় রাখিয়েই দেব। খাবে পরবে, অতুলের খোকাকে রাখ্‌বে, হোল বা ঝি না থাক্‌লে তুখানা কাজই করে দিলে। তবুও একটা লোক তো প্রতিপালন হবে। হাজার হোক্ নরেশ আমার ছেলের মত ছিল, তারি তো বৌ, দেখে মায়া হয়েছিল। ওমা, তা নয় ! পেটের ভেতর হারামের ছুরি ! বিধবা হয়েছে, এখনও গন্ধ মাখ্‌বার সখ্ যায়নি, তাই বুকের কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে এনেছে। আমি বাপু ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি, এমন ডাইনি রাখ্‌তে পার্‌বো না।"

কমল আলোর কাছে বাক্স লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ মা, বাক্সর গায়ে কার হাতের লেখা।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ?"

কমল বলিল, "নরেশ দাদার !"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে তাহার চোখ হইতে বড় বড় তুই ফোঁটা জল মাটীতে পড়িল। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণীর চক্ষুও অশ্রুময় হইয়া উঠিল।

ঘড়ি চুরি।

১

সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, এজন্য সে দিন সকালবেলা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। শেখর বাবু তখন রাস্তার দিকের জানালার কাছে ইজি চেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন; আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়াছিলাম। তখন সবে মাত্র চায়ের পিয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটী আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়াছিল।

ঘরখানি ইংরাজি ফ্যাসানের। ঘরের মেঝে মাদুরমোড়া, চেয়ার টেবিল কৌচে ঘরখানি পরিপূর্ণ, একপাশে একটী আলমারী, সেটী নূতন পুরাতন পুস্তক, সংবাদপত্র, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই ঘরটী শেখর বাবুর বসিবার ঘর।

শেখর বাবুর পূর্ণ নাম সুধাংশুশেখর বসু। আমরা উভয়ে বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছি, একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, বন্ধুদের মধ্যে এমন আর কাহাকেও বাসি কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমন দুর্ব্বোধ্য যে, আমিও এত দিনে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন, তখন কাহারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না, কিন্তু সকলের সঙ্গেই অমায়িক ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি

দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন ও উপাধি অর্জ্জন করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর শেখর বাবু পুলিসের ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; যে কয়েক বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি সবে মাত্র একটী চুরোট ধরাইয়া দিব্য আরামে সোফায় হেলান দিয়া খবরের কাগজখানি হাতে লইয়াছি, এমন সময় দেখি, দুটী ভদ্রলোক সদর দরজার ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। শেখর বাবুও তাহা লক্ষ্য করিয়া বই খানি রাখিয়া দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মহেন্দ্র বাবু আস্‌ছেন দেখ ছি। তুমি বোধ হয় ওঁকে চেন ?”

ভদ্রলোক দুইটী প্রবেশ করিলে শেখর বাবু মধুর হাস্যের সহিত তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিলেন, তাহার পর মহেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মহেন্দ্র বাবু, আজিকার সকালটা বড়ই বাদ্‌লা, এক পেয়ালা চা আনিতে বলিব কি ?”

মহেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন, “তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটা বড় দরকারী কাজের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমি এখন পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের ডিটেক্‌টিভ। এই ভদ্রলোকটী

একটী ঘড়ি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেটী চুরি গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।”

শেখর বাবু আগন্তুক ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বসুন মশায়, ব্যাপারটী কি ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বিস্তারিত করিয়া বলুন।”

“ব্যাপার এমন বিশেষ কিছু নয়। যেটী হারাইয়াছে, সেটী অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঘড়ি, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির কথা এই যে, সেটী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। আপনি ঘড়িটী উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।” শেখর বাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “ঘড়ি চুরি সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন?”

“ঘড়িটী আমার দাদার নিকট থাকিত। সম্প্রতি দাদা এখান হইতে যাইবার সময় ঘড়িটী একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মেরামত করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার কাছে রাখিয়া যান। ঘড়ি মেরামত হইয়া গেলে, আমি তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ফেরৎ ডাকে তাঁহার যে পত্র আসিল, তাহা পড়িয়াই আমি অবাক্ হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, ‘তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটী অতি অল্পদামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি।’ এই দেখুন, তাঁহার পত্র।” বলিয়া ভদ্রলোকটী একখানি খামে ভরা পত্র শেখর বাবুর হাতে দিলেন।

শেখর বাবু খামখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, “আপনার দাদা বোধ হয় রাজবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনে কাজ করেন?”

"হাঁ, তিনি রাজবাড়ীর ষ্টেশনমাষ্টার। আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় আছে?"

"না, খামখানি দেখিয়া এই রকমই অনুমান হইতেছে।" মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "খাম দেখিয়া এ কথা কিরূপে অনুমান করিলেন?"

শেখর বাবু খামখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন না, খামখানি দেখিয়া কিছু বুঝা যায় কিনা?"

মহেন্দ্র বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খাম খানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভায়োলেট কালীতে নাম ও ঠিকানা লেখা, আর এখানকার ও রাজবাড়ীর পোষ্টমার্ক, ইহা ভিন্ন খামে এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কি কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।"

"পোষ্টমার্কটী ভাল করিয়া দেখিয়াছেন?"

"হাঁ, পোষ্টমার্কে রাজবাড়ীর পর R. S. লেখা আছে বটে, কিন্তু অন্য লোকেও ত ষ্টেশনে চিঠি দিয়া যাইতে পারে।"

"চিঠিখানা কোন্ সময় সেখান হইতে রওনা হয় সেটা বুঝিয়াছেন তো?"

"ঠিক কথা, চিঠিখানা দেরিতে রওনা হইয়াছে, কিন্তু 'লেট ফি'র ছাপ নাই।"

শেখর বাবু বলিলেন, "ইহা হইতেই অনেকটা অনুমান হয় না কি যে, যিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তিনি লেট ফি না দিয়াও চিঠিখানা পাঠাইতে পারেন?"

"তিনি ষ্টেশনের কর্ম্মচারী না হইয়া পোষ্টাল কর্ম্মচারীও ত হইতে পারেন।"

"ঠিক কথা। ভায়োলেট রংয়ের কালী সচরাচর কোথায় ব্যবহার হয় বলুন দেখি।"

মহেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য হইয়া শেখর বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "শেখর বাবু, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই কালী কপিং-ইঙ্ক নামে রেলওয়ে ষ্টেশনে ব্যবহারের জন্য আজকাল চলিত হইয়াছে।"

শেখর বাবু বলিলেন, "রেলের ষ্টেশনে দরকারী কাগজপত্রের নকল রাখিবার জন্য যে কালির ব্যবহার হয়, তাহা ডাকঘরে লইয়া গিয়া তাহাই এই পত্র লিখিতে ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার।"

২

চিঠিখানি এতক্ষণ খামের মধ্যেই ছিল, এখন শেখর বাবু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্ব্বে একবার নাকে আঘ্রাণ লইলেন, তারপর কাগজখানি মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কাগজটা দেখিয়া কি মনে হয়?"

"বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফসিট। কাগজখানি ছিঁড়িবার সময় বোধ হয় তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেন না পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্ঠা ভায়োলেট কালীতে লেখা, অপর পৃষ্ঠায় কাল কাল দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধ হয়, কোন একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।"

শেখর বাবু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "বেশ মহেন্দ্র বাবু, আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, যে চিঠির এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া

লওয়া হইয়াছে, সেই চিঠিখানি স্ত্রীলোকের কি পুরুষের? আপনার কি বোধ হয়?"

"চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখার যে দাগ পড়িয়াছে, সেটা বাংলা লেখার ছাপ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের চিঠি বলিয়া ঠিক করা অনেকটা কষ্টকল্পনা। পুরুষেও তো বাংলায় পত্র লিখিয়া থাকে।"

"নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু চিঠিখানি যে পুরুষের লেখা নয় সে বিষয়ে কষ্টকল্পনা ব্যতীতও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠিখানি একবার নাকের কাছে ধরুন দেখি।"

"বাঃ, চমৎকার এসেন্সের গন্ধ।"

"হাঁ, উহা খস্‌খসের গন্ধ। ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধের পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক। এখন ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার পর আরও দেখুন, এসেন্সের গন্ধ ছাড়া যে বিশেষ একটী গন্ধ ইহাতে পাওয়া যাইতেছে, এইরূপ একটা গন্ধ টাকা পয়সা ও এসেন্স প্রভৃতি একসঙ্গে মিশাইয়া রাখার জন্য মেয়েদের বাক্সে প্রায়ই পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন। আর লিখিবার সময় কালী ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছাপ পড়িয়াছে, এরূপ অপরিষ্কার লেখাও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক সম্ভব। আর ইহা ব্যতীত হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই লেখার এই উল্টা ছাপ দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহা স্ত্রীলোকের লেখা।"

হরিভূষণ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এই ডাকের কাগজ দেখিয়া এখন আমার মনে হইতেছে, বৌদিদি এই রকম ডাকের কাগজ ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই চিঠির আধখানা কাগজে দাদা এই চিঠি লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সমস্ত বৃথা বিষয় লইয়া আপনার এই অদ্ভুত ক্ষমতার অনর্থক অপব্যবহার হইতেছে, ইহাতে চুরির কোন সন্ধান হইতেছে না।"

শেখর বাবু বলিলেন, "দেখুন, এই সব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকে সকল তথ্যই সংগ্রহ করিতে হয়, কিছুই অবহেলা করা উচিত নয়। যাহা কিছু সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা প্রয়োজনীয় হউক অথবা নাই হউক, যতদূর সম্ভব তাহা তলাইয়া দেখা উচিত। আর ইহাতে চুরির সম্বন্ধেও কতক সাহায্য হইল বই কি! এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, রাজবাড়ী ষ্টেশনে পার্শেল পৌছিয়াছে ও সেখানে আপনার দাদাও উপস্থিত ছিলেন, অতএব সেখান হইতে চুরি যাইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। যাক্, আপনি ঘড়ি কিরূপে ও কাহাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন?"

হরিভূষণ বাবু বলিলেন, "ঘড়িটী রেজেষ্ট্রি কি ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাই নাই, বেয়ারিং পার্শেল কখন খোওয়া যায় না জানিতাম, তাই বেয়ারিং করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ঘড়ি আমি নিজে হাতে প্যাক করিয়া আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ঝির হাতে দিয়া পোষ্টাফিসে পাঠাইয়াছি। পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহা ঝির জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারপর ঘড়ির সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

শেখর বাবু হরিভূষণ বাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দাদার চিঠি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "আপনার দাদা লিখিয়াছেন, চলন্ত ঘড়ি পাইয়াছিলেন, আপনি কি এখানে ঘড়িতে চাবি দিয়া দিয়াছিলেন?"

"হাঁ, আমার মনে কেমন একটা খেয়াল হইয়াছিল যে, এখান হইতে দম দিয়া পাঠাইলে ঘড়ি চলন্ত অবস্থায় পৌছায় অথবা কোন সময় বন্ধ হয়, তাহা পরীক্ষা করিব, সেইজন্য আমি ঠিক দশটার সময় দম দিয়া দিই, এবং দাদাকেও ঘড়ি চলিতেছে অথবা কয়টা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে, তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলাম।"

মহেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেখর বাবু, আপনি বোধ হয় ঝির উপরেই সন্দেহ করিতেছেন, কিন্তু আমি ঝির ও তাহার আত্মীয়গণ কলিকাতায় যে যেখানে আছে, তাহাদের এমন ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি যে, তাহারা চুরি করিলে নিশ্চয় ধরা পড়িত।"

হরি বাবু বলিলেন, "আমারও মনে হয় না যে, বামা চুরি করিয়াছে। সে আমাদের অতি বিশ্বাসী ঝি। বিশেষতঃ পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহাই সে জানিত না।"

শেখর বাবু বলিলেন, "অবশ্য আপনি কাহাকেও বলিয়া দেন নাই যে পার্শেলের ভিতর ঘড়ি পাঠাইতেছেন, কিন্তু পার্শেলের ভিতর একটা চলন্ত ঘড়ি পাঠাইলে যাহার হাতে পড়ে সে কি আর বুঝিতে পারে না?"

"ঘড়িটী প্যাক করার পর ওকথা আমার মনে হইয়াছিল, সেই জন্য পাঠাইবার আগে কানের নিকট ধরিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, কিছুই শুনা যায় না।"

শেখর বাবু বলিলেন, "ঘড়ির শব্দ অনেক সময় কানে শোনা অপেক্ষা স্পর্শের দ্বারা বেশী বুঝা যায়। আপনি যদি পার্শেলটা চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে কোন না কোন অবস্থায় ঘড়ির শব্দ বুঝিতে পারিতেন। এই দেখুন, এই ঘড়িটীর উপর এই ছড়িখানি ছোঁয়াইয়া রাখিলাম, অন্য দিকটা আপনি দাঁতে করিয়া ধরুন। শব্দ পাইতেছেন?"

হরি বাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তাহার পর দাঁতের ছড়িটী ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে আগে বলি নাই, ঘড়ির সঙ্গে আমি একটা থার্ম্মমিটারও পাঠাইয়া ছিলাম। সেটী চুরি যায় নাই।"

শেখর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে কৌটায় প্যাক করা হইয়াছিল, তাহা কত বড়?"

হরি বাবু বলিলেন, "তাহা থার্ম্মমিটারটির মতই লম্বা ছিল। থার্ম্মমিটার তাহাতে ঠিক আঁটিয়াছিল।"

"তাহা হইলে তো এ বিষয় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, থার্ম্ম-মিটারের খাপের সঙ্গে ঘড়ি লাগিয়াছিল ও তাহার প্রান্ত দুইটী টিনের কৌটার গায়ে লাগিয়াছিল, তাহারই উপর হয়তো হঠাৎ চোরের হাত পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই সে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই সব প্রমাণে বামার উপরেই সন্দেহ হয় বটে; কিন্তু বামা ঘড়ি পাওয়ার পনেরো মিনিট পরেই পোষ্টা-ফিসে দিয়া আসিয়াছে, এ খবর আমি ঠিক জানিতে পারিয়াছি। যদিও ঘড়ি ডাকে দিতে যাইবার সময় পথে তাহার ভাইপোর

সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তথাপি তাহার দ্বারা এ কাজ হয় নাই, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।” শেখর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার তবে কাহার উপর সন্দেহ হয়?”

“আমার অনেকটা এই রকম বিশ্বাস হইয়াছিল, আর এখনও মনে হয় হরি বাবুই পাঠাইবার সময় একটা গোলমাল করিয়াছেন।”

হরি বাবু ম্লানভাবে হাসিলেন, বলিলেন, “আজকাল পুলিশে যাওয়া বিষম বিড়ম্বনা। যিনি অভিযোগ করিতে যাইবেন, পাকে প্রকারে তাঁহাকেই অভিযুক্ত হইতে হইবে। মহেন্দ্র বাবু যেরূপ ভাবে আমাদের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়াছিলেন, তাহাতে উনি যদি আমার বিশেষ বন্ধু না হইতেন, তবে উঁহার সঙ্গে আমার বিষম মনোবিবাদ হইত!”

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, “কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাদের এই সব অসন্তোষকর কার্য্য করিতে হয়।”

“যে ঘড়িটী পাওয়া গিয়াছে, সেটী কোথায়?” হরি বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, “এই ঘড়িটী দাদা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন।”

“কবে পাঠাইয়াছেন?”

“তিনি ঘড়ি পাইয়াই যখন দেখিলেন, তাঁহার ঘড়ি নয়, তখন সেইদিনই যে ট্রেণে তাঁহার চিঠি ফেলিয়াছিলেন সেই গাড়ীর গার্ডের হাতে আমার নিকট ফেরৎ দিবার জন্য ঘড়িটী দিয়াছিলেন। গার্ড আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে।”

“পোষ্টাফিসে সন্ধান করিয়া কি জানিতে পারিলেন?” মহেন্দ্র

বাবু বলিলেন, "পোষ্টাফিস হইতে চুরি যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। পোষ্টমাষ্টার রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে, তিনি দু'টার সময় দারজিলিং মেলে দিবার জন্য পার্শেল রওনা করিয়া দিয়াছিলেন।"

শেখর বাবু বলিলেন, "তিনি ১২ টার সময়েও তো ডাক রওনা করিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারিতেন।" তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বড় ছেলের নাম রাজকৃষ্ণ নয়?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তিনিই তো সিমলা পোষ্টাফিসে কাজ করেন।"

শেখর বাবু ভাবিতে ভাবিতে ঘড়িটীর চারিদিক মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে একটু চিন্তিত ভাবে হরি বাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটী পাইলেই আপনি বোধ হয় সন্তুষ্ট হন। চোরকে ক্ষমা করিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই। কারণ যে চুরি করিয়াছে, তাহার বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহাকে জেলে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। চোর ধরা না পড়িলে ঘড়িটী কি করিয়া পাইবেন, বুঝিতে পারিতেছি না; আর আপনি কোন অনুসন্ধান না করিয়া এ সমস্ত কি প্রকারে জানিলেন?"

শেখর বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটাই চোরকে দেখাইয়া দিতেছে।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া ব্যগ্র ভাবে ঘড়িটী হাতে লইলেন ও খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

"ঘড়ির উপর কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে এবং ঘড়ির রিংয়ে একটু সূতা বাঁধা আছে দেখিতে পাইতেছি, চিহ্নের মধ্যে তো এই!"

শেখর বাবু বলিলেন, "উপরের দাগ কিছুই নয়, ঘড়ির সঙ্গে এক পকেটে টাকা কি অন্য রকম পদার্থ ছিল, দাগ দেখিয়া তাহাই বুঝা যায়। বরং ঘড়ির ভিতরে যেখানে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয়, সেখানে যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে, ঘড়িটী যাহার নিকট ছিল, তাহার মদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনু-রাগ জন্মিয়াছে। মাতালদের হাত কাঁপে বলিয়া চাবি দিবার সময় ঘড়িতে এইরূপ দাগ হয়। তবে রিংয়ে যে সূতা আছে, সেটীও একটী সূত্র বটে, কিন্তু সর্ব্ব প্রধান সূত্র এখনও আপনি ধরিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে কাল সন্ধ্যার সময় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঘড়ির সম্বন্ধে মীমাংসা করিব। আপনা-দের কাহারও তাঁহার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।"

৩

পরদিন সন্ধ্যার সময় পোষ্টমাষ্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখর বাবুর সদাপ্রসন্ন মুখখানি আজ একটু বিমর্ষ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণ বাবুকে বাড়ীর সংবাদ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পকেটে হাত দিয়া যেন আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায় গেল?" তার পর রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, "আপনার

ঘড়িটী দিন তো, সময়টা দেখি।" রাজকৃষ্ণ বাবু ঘড়িটী বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটা একটা কাল রংএর কারে বাঁধা ছিল। শেখর বাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাস দিয়া কারের গিরা বাঁধা জোড়ার জায়গাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন, "দেখুন, আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কলিকাতায় আসিয়া ও নূতন চাকরীতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এ কথা নিশ্চয় জানিবেন যে, পাপ কখনও লুকান থাকে না। আমাদের কর্ত্তব্য আপনাকে রাজদ্বারে সমর্পণ করা, কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণ বাবুর ঘড়িটী অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দিবেন।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু যেন কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কেন যে এরূপ বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

শেখর বাবু বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। আমার নিকট এই যে ঘড়ি রহিয়াছে, এটি আপনার ঘড়ি। ইহার রিংয়ে এই যে রেশমটুকু বাঁধা আছে তাহা আপনার ওই কারের। ঘড়ি বদলাইবার সময় তাড়াতাড়িতে কারটী না খুলিতে পারিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আপনি এ সব কার্য্যে তেমন পাকা নহেন, কাজেই রিং হইতে কারের এটুকু অংশ কাটেন নাই! তার পর

দেখুন, ফণি বাবু যে ঘড়ি পাইয়াছেন, সেটী তখন চলিতেছিল, চলন্ত অবস্থাতেই তিনি তাহা সেই দিন ফেরৎ পাঠান, এখানে আসিয়া সাতটা বাজিয়া ঘড়িটী বন্ধ হয়। কাল আমি ঘড়িটীতে চাবি দিয়া দেখিয়াছি ঘড়িটী ঠিক ত্রিশ ঘণ্টা সময় রাখে। অতএব একটার সময় ঘড়িতে চাবি দেওয়া হইয়াছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। মহেন্দ্র বাবু আমাকে বলিয়াছেন, পোষ্টাফিসের খাতাপত্রেও প্রকাশ এবং আপনিও স্বীকার করিয়াছেন, ঘড়ি দুটা পর্য্যন্ত আপনার কাছেই ছিল, তাহার পর তাহা মেলে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি একটার সময় চাবি দিয়া এই ঘড়িটী প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রমাণ যে কোন আদালতে আপনাকে দোষী করিবে তাহা বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন।”

৪

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্র বাবু ও হরি বাবু উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র বাবু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, “শেখর বাবু, ব্যাপার কি? সেই অল্পবয়স্ক চোর ও চোরাই ঘড়ির কোন সন্ধান পাইয়াছেন নাকি?”

শেখর বাবু হাসিয়া বলিলেন, “চোরটার সন্ধান আপাততঃ দিতে পারিতেছি না, ঘড়িটার সন্ধান পকেটেই আছে”—বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া দিলেন।